শচীনন্দন

প্রকাশকাল

মাঘী পূর্ণিমা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদনায়

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, জয়পুর

সম্পাদনা পরিষদ

ড. সুভাষ দেব, সহকারী অধ্যাপক
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ
সুবীর চন্দ্র দেব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
চিন্ময় ভট্টাচার্য্য, কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা, মিরপুর
শ্যামল আচার্য্য, সঙ্গীত শিক্ষক, শ্রীমঙ্গল
রাজীব ভট্টাচার্য্য, জয়পুর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অবিনাশ আচার্য

মুদ্রক

মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স, শ্রীমঙ্গল। ০১৭১২-৯৭৪৫৪৩

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম-এ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এ উপলক্ষে 'শচীনন্দন' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার অন্তর্গত ৬ নম্বর মিরপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয়– যা শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গনধাম মন্দির নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। শচীরানী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই তীর্থ স্থান। প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে এই ভূমি।

চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ভারতবর্ষে আবির্ভূত এক বহুলোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু মহাপুরুষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পর্যন্ত শ্রীহরি নাম, ভক্তি ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করেন যা শ্রীকলিসন্তরণ উপনিষদে ও শ্রীপদ্মপুরাণের হরপার্বতী সংবাদে উল্লেখিত রয়েছে।

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসযাত্রার দিনে সম্মিলিতভাবে উদযাপিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরো প্রক্রিয়াটি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে ৪-৫ দিনব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান ও একে কেন্দ্র করে পালিত অন্যান্য অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় পরিপূর্ণ একটি সামাজিক উৎসব। এই উৎসব পরিণত হয় সকল সম্প্রদায়ের হাজার মানুষের এক মিলন-মেলায়। এই মিলন-মেলায় আগত সবার মাঝে উজ্জীবিত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থতা এবং কর্তব্য-বোধের এক সুদূর প্রসারী সংস্কৃতি –যা প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। কারণ এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হলেও যেভাবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা একে দেখেশুনে রাখেন তা প্রশংসার যোগ্য। সংশ্লিষ্ট সকলের নিরন্তর সহযোগিতায় এই মন্দির উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে অনুষ্ঠেয় ৪৩তম শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একে ঘিরে গৃহীত উৎসবের সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশিতব্য স্মরণিকা 'শচীনন্দন' সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোঃ আব্দুস শহীদ এমপি
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম-এ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং এ উপলক্ষে 'শচীনন্দন' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয়। যা 'শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দির' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। শচীরানী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই তীর্থ স্থান। প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে এই ভূমি।

প্রজ্ঞাবান দার্শনিক ড. মাহনামব্রত ব্রহ্মচারীজির তত্ত্বাবধানে ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা সিলেটের নিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর কর্মেদ্যোগে গত শতকের আশির দশকে এই লুপ্ত তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর থেকে মানুষের দানে তিলে তিলে গড়ে ওঠে এই ধর্মস্থান।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমে নামকরণ 'শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র' করা হয়েছিল। তার গাত্রবর্ণ গৌর ও স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গৌরসুন্দর' নামে অভিহিত করা হত। অন্যদিকে, নিম্ব বৃক্ষের নিচে জন্ম বলে তার মাতা তাঁকে 'নিমাই' বলে ডাকতেন তাই নবদ্বীপবাসীও নিমাই পণ্ডিত বলে তাঁকে অভিহিত করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীসাহিত্য বঙ্গীয় সন্তজীবনী ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। সে যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করে গেছেন।

তাঁরই মামারবাড়ি জয়পুরে অবস্থিত শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসযাত্রার দিনে সম্মিলিতভাবে উদযাপিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরো প্রক্রিয়াটি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে ৪-৫ দিনব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান ও একে কেন্দ্র করে পালিত অন্যান্য অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় পরিপূর্ণ একটি সামাজিক উৎসব। এই উৎসব পরিণত হয় সকল সম্প্রদায়ের হাজার মানুষের এক মিলন-মেলায়। এই মিলন-মেলায় আগত সবার মাঝে উজ্জীবিত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থতা এবং কর্তব্যবোধের এক সুদূরপ্রসারী সংস্কৃতি –যা প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ।

এবারের শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে অনুষ্ঠেয় ৪৩তম শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একে ঘিরে গৃহীত উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলায় পরিণত হবে –এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই শুভ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা 'শচীনন্দন' এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. সামন্ত লাল সেন
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

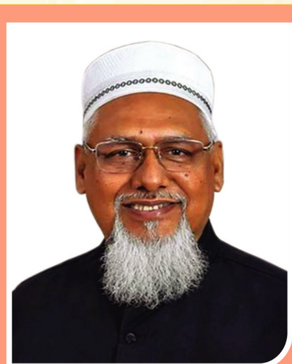

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম প্রতিবছরের ন্যায় এবারে 'শচীনন্দন' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান। শচীরানী ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা। হবিগঞ্জ জেলাধীন বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের মাতুলালয় যা ভক্তদের কাছে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দির নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম যৌবনে ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। মাত্র বিশ বছর বয়সে ব্যাকরণশাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য একটি টোল স্থাপন করেন। তর্কশাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি ছিলো সর্বজনবিদিত। ছেলেবেলা থেকেই রূপ ও শ্রীহরির নামকীর্তনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

তিনি গয়ার ঈশ্বরপুরীর নিকট শ্রীশ্রীগোপাল অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্ররাজে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে শিক্ষানুরাগী পণ্ডিত থেকে কৃষ্ণভাবময় ভক্তরূপে অবির্ভুত হন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে বৈষ্ণবসমাজে অগ্রণী নেতায় পরিণত হন। তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ উপেক্ষা করে নিম্নবর্ণের মানুষদের বুকে টেনে নেন। তাঁর প্রভাবে সেই সময়ে অনেকে বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেন।

মাত্র ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি কয়েক বছর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। জীবনের শেষ ২৪ বছরের অধিকাংশ সময় তিনি জগন্নাথধাম পুরীতে অতিবাহিত করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে আষাঢ়ে মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে ৪৮ বছর বয়সে পুরীধামে তার লীলাবসান ঘটে।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসযাত্রার দিনে শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানকে ঘিরে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনমেলা। এ অনুষ্ঠান যেন আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের সবাইকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত-সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন সে লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

আমি ৪৩তম শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানের সফলতা কামনা করি এবং 'শচীনন্দন' স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: ফরিদুল হক খান এমপি
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমপূজনীয় মাতা শচীরানীর স্মৃতিবিজড়িত হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মিরপুর ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে অবস্থিত শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দিরে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত এবং এ উপলক্ষে 'শচীনন্দন' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এক তীর্থস্থান। প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে এই ভূমি। একইসঙ্গে বছরজুড়ে দেশ-বিদেশের ভক্তরাও এই তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষায় নামযজ্ঞ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণের অন্যতম প্রতিভাস। প্রাচীন এই শাস্ত্রীয় আচার মনকে করে আয়নার মতো পরিষ্কার, সরিয়ে দেয় কর্মের ধুলো এবং মনন প্রজ্বলনের মাধ্যমে নেতিবাচক আবেগ এবং অশান্তিকে করে দগ্ধ।

সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরো প্রক্রিয়াটি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে চার থেকে পাঁচদিনব্যাপী পালিত যজ্ঞানুষ্ঠান ও একে কেন্দ্র করে আয়োজিত অন্যান্য অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় পরিপূর্ণ একটি সামাজিক উৎসব। এই উৎসব পরিণত হয় সকল সম্প্রদায়ের হাজার মানুষের এক মিলন-মেলায়। এই মিলন-মেলায় আগত সবার মাঝে উজ্জীবিত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থতা এবং কর্তব্য-বোধের এক সুদূরপ্রসারী সংস্কৃতি যা প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক অনুধ্যায়।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দির পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই পবিত্র স্থানের ঐশ্বরিক গাম্ভীর্যসহ নানা বিষয় এবং সেখানকার মানুষের ব্যবহার, আতিথেয়তা ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের ঐকান্তিকতা আমাকে বিমোহিত করেছিল। সংশ্লিষ্ট সকলের নিরন্তর সহযোগিতায় এই মন্দির উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে অনুষ্ঠেয় ৪৩তম শ্রীশ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একে ঘিরে গৃহীত উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলায় পরিণত হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই শুভ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা শচীনন্দন সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

আমার নির্বাচনী এলাকা বাহুবলের জয়পুর গ্রামে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম-এ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানামযজ্ঞসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এ উপলক্ষে 'শচীনন্দন' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শচীরানী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এই তীর্থ স্থান। প্রজ্ঞাবান দার্শনিক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির তত্ত্বাবধানে ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা সিলেটের নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামীর কর্মউদ্যোগে গত শতকের আশির দশকে এই লুপ্ত তীর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর থেকে ভক্তজনের দানে তিলে তিলে গড়ে ওঠে এই ধর্মস্থান এবং প্রতি বছর নানা অনুষ্ঠানে মুখরিত থাকে এই ভূমি। একইসঙ্গে বছরজুড়ে দেশ-বিদেশের ভক্তরাও এই তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষায় নামযজ্ঞ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি ভক্তি ও আত্মসমর্পণের প্রকাশ। সম্মিলিতভাবে উদযাপিত যজ্ঞানুষ্ঠানের পুরো প্রক্রিয়াটি ঐক্য ও সম্প্রীতিকে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে ৪-৫ দিনব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান ও একে কেন্দ্র করে পালিত অন্যান্য অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয় পরিপূর্ণ একটি সামাজিক উৎসব। এই উৎসব পরিণত হয় সকল সম্প্রদায়ের হাজার মানুষের এক মিলন-মেলায়। এই মিলন-মেলায় আগত সবার মাঝে উজ্জীবিত হয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থতা এবং কর্তব্য-বোধের এক সুদূরপ্রসারী সংস্কৃতি যা প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। কারণ এটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হলেও যেভাবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা একে দেখেশুনে রাখেন তা প্রশংসার যোগ্য। এমন অসাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন আমার বাহুবলের গৌরবকে সমৃদ্ধ করেছে।

জনপ্রতিনিধি হওয়ার আগে থেকেই আমার যাতায়াত থাকলেও ২০১৪ সালে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য হওয়ার পর থেকে এই ধর্মস্থানের সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ ঘটে। সংশ্লিষ্ট সকলের নিরন্তর সহযোগিতায় এই মন্দিরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে অনুষ্ঠেয় ৪৩তম শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একে ঘিরে গৃহীত উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে অসাম্প্রদায়িক মিলনমেলায় পরিণত হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই শুভ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা 'শচীনন্দন' সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ধন্যবাদন্তে

আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী
সংসদ সদস্য
২৩৯, হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল)

সম্পাদকীয়

মূলত জন্মান্তর হয়েছিল এক জনপদেরই। ভাগীরথী তীরের নবদ্বীপ থেকে পুরো গৌড়বঙ্গ তথা বঙ্গসমাজ। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষে তখন বাঙালির জীবনে একাধিক পরিবর্তন এসেছিল। পরিবর্তন এসেছিল বিদ্যাভাবনা ও পুণ্যচর্চার ক্ষেত্রেও। পরিবর্তিত হচ্ছিল বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্ব পাচ্ছিল বাংলা রচনাও। সাহিত্যভাবনা ও শাস্ত্রচিন্তার সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়েছিল প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির। সেই সংঘাতের পর্বে বিদ্যাভাবনা ও সমাজের এককগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছিল। যেন নবজন্মই হচ্ছিল বাঙালি সমাজের। তখনই জন্ম নিমাই ও তাঁর নতুন ধর্ম'র। (নিমাইয়ের জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রি.)। নিমাই সন্ন্যাস নেয়ার পর নাম হয় চৈতন্য মহাপ্রভু।

তৎকালে বাঙলার সমাজে ছিল 'জাতের নামে বজ্জাতি'। স্মৃতিকারেরা এতোটাই আত্মকেন্দ্রিক ও সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন, অবক্ষয়কে তাঁরা একেবারেই বুঝতে পারেননি। বুঝেছিলেন চৈতন্যদেব। মধ্যযুগে জন্মেও তিনি ছিলেন আধুনিক, কুসংস্কারহীন এবং মুক্ত মনের মানুষ। মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। সামাজিক অচলায়তনকে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন। বর্ণভেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্ত্যজ-শ্রেণির মানুষকে কোলে ঠাঁই দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মানবাত্মার অপমান তাঁর অভিপ্রেত নয়।

সবমিলিয়ে বাঙালির মনন ও মনীষার উৎকর্ষ সাধনে চৈতন্যদেব ছিলেন প্রথম যাজ্ঞিক। মধ্যযুগে তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির রোচিষ্ণু অধ্যায়। বাংলার মাটিতে তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্গসংস্কৃতির অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেত। বাংলার সাহিত্য সংগীত শিল্পকলা ভাস্কর্য নাটক ও দার্শনিক ভাবনায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে চৈতন্য-বিভব। তাঁর দূরদর্শিতা উদারতা মানবিকতা সমাজকে যে নবচেতনায় উদ্ভাসিত করেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তৎকালীন জনজীবনে তিনি যে পরিবর্তন এনেছিলেন তা সেকালের রক্ষণশীল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

সেই নাড়া দেয়ার ফলে আজও আমাদের সমাজে যেটুকু চলমানতা লক্ষ করা যায়, তার সবটুকুই যে চৈতন্য অবদান তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজের প্রায় প্রতিটি অনুষঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আজও রয়েছে চৈতন্যদেবের অনিবার্য উপস্থিতি। অথচ চৈতন্যদেবের সামাজিক অবদানের সংবেদনশীল ধারাটি সেভাবে জনমানসে প্রসৃতি লাভ করেনি। দেশে-বিদেশে তাঁকে নিয়ে তাই আজও চলছে নিরন্তর গবেষণা।

চৈতন্যদেব ছিলেন মানবতাবাদী। তাঁর মানবতাবাদ ও সমাজভাবনা ছিল প্রগতিশীল। তাঁর মানবিক আদর্শ আজও বিশ্বের পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখাতে পারে। সারাটি জীবন তিনি মানবকল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন। কুসংস্কারকে ভেঙে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বঙ্গসংস্কৃতির অনেকটাই তো চৈতন্যকেন্দ্রিক। আমাদের সমাজে আজও চৈতন্যপ্রভাব সীমাহীন। তাঁর মনন ও মনীষা আজও আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাঁর জীবনচরিত যত পড়েছি ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

অবশেষে তাঁরই মাতুলালয় জয়পুরে অবস্থিত শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামের ৪৩তম বার্ষিক উৎসবে এই মহান মানবতাবাদী মানুষটিকে নিয়ে সংকলিত করেছি 'শচীনন্দন' নামক স্মরণিকা গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে বস্তুবাদের বিচারে বেশ কিছু লেখা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চারজন মাননীয় মন্ত্রী (কৃষি, স্বাস্থ্য, ধর্ম ও ভূমি) বাণী দিয়ে বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। বাণী দিয়ে উৎসাহিত করেছেন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য (হবিগঞ্জ-১, বাহুবল-নবীগঞ্জ জনাব আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরীও। গ্রন্থটির নাম নির্বাচন করে দেয়ার জন্য শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া গ্রন্থটিতে যারা লেখা এবং বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমার কমিটি আমাকে এই গ্রন্থটি সংকলনে সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়ার তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে চৈতন্যপ্রেমী পাঠকদের হাতে 'শচীনন্দন' স্মরণিকা নামক গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক
'শচীনন্দন' স্মরণিকা

চৈতন্য জীবনের কালক্রম

চৈতন্য জীবনের কালক্রম নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদার, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। গবেষণায় দেখা গেছে চৈতন্য জীবনের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া নান ঘটনার ক্ষেত্রে জীবনকারদের রচনায় অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। তবু গবেষকরা নানা দিক বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এখানে চৈতন্য জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সম্ভাব্য কালক্রম উপস্থাপন করা হল-

১. জন্ম	: ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রি. (জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মতে) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রি. (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মতে)		
২. অন্নপ্রাশন ও নামকরণ	: আগস্ট ১৪৮৬ খ্রি.	৩. উপনয়ন	: এপ্রিল-মে ১৪৯৫ খ্রি.
৪. প্রথম বিবাহ	: ১৫০১-০২ খ্রি.	৫. পূর্ববঙ্গে যাত্রা	: ১৫০৫ খ্রি.
৬. দ্বিতীয় বিবাহ	: ১৫০৭ খ্রি.	৭. গয়াযাত্রা	: অক্টোবর ১৫০৮ খ্রি.
৮. প্রত্যাবর্তন	: জানুয়ারি ১৫০৯ খ্রি.	৯. সন্ন্যাস গ্রহণ	: ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫১০ খ্রি.
১০. নীলাচলে আগমন	: মার্চ ১৫১০ খ্রি.	১১. দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শুরু	: এপ্রিল ১৫১০ খ্রি.
১২. নীলাচলে প্রত্যাবর্তন	: মে ১৫১২ খ্রি.	১৩. গৌড়যাত্রা	: সেপ্টেম্বর ১৫১৪ খ্রি.
১৪. বৃন্দাবনে গমন	: ১৫১৫ খ্রি.	১৫. এলাহাবাদে আগমন	: জানুয়ারি ১৫১৬ খ্রি.
১৬. বারাণসীতে আগমন	: ১৫১৬ খ্রি.	১৭. নীলাচলে প্রত্যাগমন	: মে ১৫১৬ খ্রি.
১৮. তিরোধান	: ২৭ এপ্রিল ১৫৩৩ খ্রি. রবিবার, অক্ষয় তৃতীয়া।		

প্রসঙ্গত, বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যদেবের গয়া হতে প্রত্যাগমন কাল নির্দেশ করেছেন ১৪৩০ শকাব্দের পৌষান্তে, কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের কাল নির্দেশ করেছেন ২৯ মাঘ ১৪৩১ শকাব্দ (ফেব্রুয়ারি ১৫১০)। গয়া হতে ফিরে চৈতন্যদেব ১৩ মাস নবদ্বীপে ছিলেন।

* জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মতে, চৈতন্যদেবের জীবনকাল ৪৭ বছর ২ মাস ৯ দিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সময়কালকে ৪৮ বছর এবং কবি কর্ণপুর ৪৭ বছর উল্লেখ করেছেন।
* তিনি গৃহে ছিলেন ২৩ বছর ১১ মাস ২৫ দিন। এই সময়কাল নবদ্বীপ লীলার ব্যপ্তি। এই সময়কালই নবদ্বীপ লীলার ব্যাপ্তি।
* তার সন্ন্যাসজীবন পরিব্যপ্ত ছিল ২৩ বছর ২ মাস ১৪ দিন।
* প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ৬ বছর তীর্থভ্রমণ করেছিলেন আর ১৮ বছর ছিলেন নীলাচলে।
* মুরারিগুপ্তের কড়চায়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এবং বাসু ঘোষের একটি পদে দ্বিতীয়বার চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।
* চৈতন্যদেব লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পূর্ববঙ্গ গমনের সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। আর সন্ন্যাসগ্রহণ করেন ২৪ বছর বয়সে।
* চৈতন্যদেব নীলাচলে আগমনের পর ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে এই সময়কাল ছিল একমাসের অধিক, আবার কর্ণপুরের মতে মাত্র ১৮ দিন।
* গৌড়ীয় ভক্তদের রচনানুসারে চৈতন্যদেবের প্রয়ান ঘটেছিল রথযাত্রাকালে। কিন্তু ওড়িয়া ভক্তদের রচনায় তাঁর মৃত্যুকাল বলা হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। বিশিষ্ট গবেষক এল.ডি.এস. পিল্লাই জানিয়েছেন, ওই বছর অক্ষয় তৃতীয়া ছিল ২৭ এপ্রিল। যেহেতু চৈতন্যদেব ওড়িশাতে প্রয়াত হয়েছিলেন তাই আমরা ওড়িয়া ভক্তদের মতটিকেই গ্রহণ করলাম।

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় : রণধীর চক্রবর্তী, দেবেশ চন্দ্র ঘোষ ও নৃপেষ দেব

মহামন্ত্র

নিখিল ভট্টাচার্য্য

ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন তাঁকেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিবেচনায় ঈশ্বর বলা হয়। উপনিষদসমূহে তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। উপনিষদের ব্রহ্ম নাম রূপের অতীত। ব্রহ্মতত্ত্বই উপনিষদসমূহের বিবেচ্য। ব্রহ্ম থেকে এসেছে জীব আর জগৎ। তাই জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বও উপনিষদের উপজীব্য। জগৎ স্রষ্টা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করে এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। সেই স্রষ্টাকেই উপনিষদের ভাষায় 'ব্রহ্ম' বলা হচ্ছে। জগৎ ও জীবের মাঝে ব্রহ্মকে দেখাই উপনিষদসমূহের বিষয়বস্তু।

উপনিষদ মূলত বেদের ভাষ্য। বেদের জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষদ। একে বেদান্তও বলা হয়। বেদ মানে জ্ঞান। বেদান্ত তাহলে জ্ঞানের শেষ প্রান্ত। শেষপ্রান্ত তো বটেই। কারণ আমার চারপাশের জগতে, জগতের সকল জীবে এবং আমাতেও যদি সেই পরমসত্য ব্রহ্মকে আবিষ্কার করতে পারি তবে তো আর কিছু বাকি থাকলো না। এ অবস্থা তো জ্ঞানের শেষ প্রান্তই। অন্যকথায় বলা যায় বেদান্ত মানে ভেদ অন্ত। এক ব্রহ্মই যেখানে সকল জীব আর জগৎ হয়েছেন সেখানে সকলের এবং সবকিছুর তাত্ত্বিক পরিচয় এক এবং অভিন্ন। তাত্ত্বিক পরিচয় স্থায়ী। বাহ্যিক পরিচয় ক্ষণস্থায়ী। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে বা জীবে জীবে আর কোন ভেদ থাকলো না। অতএব বেদান্ত মানে 'ভেদ অন্ত'। বর্তমান সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই ভেদবাদ এই জগৎ আর জীবকে নির্যাতন করেছে, মাঝে মাঝে বিনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ভেদবাদই সকল রক্তপাতের কারণ। এই ভেদবাদের কারণে কত তত্ত্ব যে হারিয়ে গেছে, কত জাতি যে বিনষ্ট হয়ে গেছে এর হিশেব আমাদের ইতিহাস রাখতে পারেনি। ভেদবাদের কারণে আজকের দিনেও বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে। একমাত্র বেদান্তের সুউচ্চ দর্শনই পারে ভেদবাদ দূর করে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করতে।

সাম্যবাদী বিশ্ব সৃষ্টির মূলসূত্র বেদেই নিহিত। জগদগুরু শঙ্করাচার্য সেই সূত্রগুলোকে বলেছেন মহামন্ত্র। শঙ্করাচার্য চার বেদে চারটি মহামন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই চারটি মহামন্ত্র আবার চারটি উপনিষদে ব্যক্ত হয়েছে।

চারবেদের চার মহামন্ত্র

১। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম- ঐতরেয় উপনিষদ, ঋগ্‌বেদ

২। তত্ত্বমসি - ছান্দোগ্য উপনিষদ, সামবেদ

৩। অহং ব্রহ্মাস্মি- বৃহদারণ্যক উপনিষদ, যজুর্বেদ

৪। অয়মাত্মা ব্রহ্ম - মাণ্ডুক্যোপনিষদ, অথর্ববেদ

চার বেদের এই চারটি মহামন্ত্র অতঃপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা গেল।

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম

(ঐতরেয় উপনিষদ- ঋগ্বেদ)

প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞা মানে জ্ঞান। প্রজ্ঞা মানে অনুভূতি। প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা কোন কিছু জানি বা বুঝি। প্রজ্ঞা দ্বারাই জীব বেঁচে থাকে। প্রজ্ঞা দ্বারাই জীব ব্রহ্মানুভূতি লাভ করে। তাই ঋক্ বেদ বলছেন প্রজ্ঞানংব্রহ্ম।

বাক্ বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদ। ইতরানন্দন মহীদাস এই ঐতরেয় উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষি। মহীদাসের জননী হীন জাতির কন্যা হলেও তৎপুত্র মহীদাস ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ঋষি হয়েছিলেন। মহীদাস 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা' এই মহাবাক্যের দ্রষ্টা।

ঐতরেয় শ্রুতি প্রথমেই বলছেন- আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষ্যৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। নিমেষযদি ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। কে সেই আত্মা? প্রজ্ঞানই সেই আত্মা। ঐতরেয় উপনিষদ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন তুলেছেন- কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতবঃ স আত্মা- যেন বা রূপং পশ্যতি, যেনা বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজান্যতি? কে সেই আত্মা? যা দ্বারা

লোকে রূপ দেখে, শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, কথা বলে ও স্বাদু অস্বাদু আস্বাদন করে তিনিই কি সেই আত্মা?

হ্যাঁ। এই সমস্তই সেই প্রজ্ঞান স্বরূপ আত্মার উপাধিমাত্র। এই প্রজ্ঞানাত্মাই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, পৃথিবী, বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, সচল অচল প্রাণী, তিনিই মানুষ, হস্তী, মশক, পিপীলিকা, উদ্ভিজ্জ সব। প্রজ্ঞানই সমুদয়কে সত্তাবান করেন। প্রজ্ঞানেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয়। অতএব প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম)।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন তুমিই ব্রহ্ম (তত্ত্বমসি)। তোমার ভেতর যে আত্মা আছেন সেই আত্মাই ব্রহ্ম। তোমার প্রকৃষ্ট পরিচয় তোমার দেহ নয়, আত্মা। সেজন্য তুমিই ব্রহ্ম। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের তাৎপর্য হলো 'আত্মা ব্রহ্ম'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। আমিই ব্রহ্ম। আমার ভেতরে যে আত্মা আছেন তিনি ব্রহ্ম। আমার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেহ নয়, আত্মা। সেজন্যে অহং ব্রহ্মাস্মি। আমিই ব্রহ্ম। সুতরাং অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রের তাৎপর্যও 'আত্মা ব্রহ্ম'।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলছেন অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা মানে কোন্ আত্মা? আত্মা তো একটিই। আকাশের এক চাঁদ যেমন প্রতিটি জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি এক আত্মাই প্রতিটি জীব হৃদয়ে বিরাজ করেন। সেই আত্মাই ব্রহ্ম।

ঐতরেয় উপনিষদ বলছেন 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। উপর্যুক্ত তিনখানি উপনিষদে যেখানে আত্মাকে ব্রহ্ম বলে নির্দেশ করা হলো সেখানে ঐতরেয় প্রজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলছেন। প্রজ্ঞান মানে কী? প্রজ্ঞান মানে জ্ঞান। জ্ঞানের সঙ্গে আত্মার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। যেখানে আত্মা আছেন সেখানেই জ্ঞান আছে। সে জ্ঞান জাগতিকই হোক কি তাত্ত্বিকই হোক আত্মার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আত্মা না থাকলে জ্ঞানও নেই। মুমূর্ষু মানুষের পাশে তার আত্মীয় বন্ধুরা বসে জিজ্ঞেস করে, আমাকে চিনতে পারছে? মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি বলে, হ্যাঁ চিনতে পারছি, তুমি অমুক, তাহলে আত্মীয়েরা আশ্বস্ত হয়। তারা ভাবে লোকটির জ্ঞান আছে, তার আত্মা সক্রিয়। অর্থাৎ রোগীর অবস্থা ভাল। রোগী যদি কোন উত্তর না দেয়। তাহলে তারা ভাবে লোকটির জ্ঞান নেই। তার আত্মা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হতে চলছে। অর্থাৎ রোগীর অবস্থা খারাপ। লোকটি মরে গেলে পর তার আর জ্ঞানের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং জ্ঞানেই আত্মা। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

ইতর প্রাণীতেও যতক্ষণ আত্মা ততক্ষণ জ্ঞান। একটি জ্যান্ত সাপ মানুষ দেখলেই আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে যায়। মৃত সাপ পালায় না। জ্যান্ত সাপের ভাল মন্দের জ্ঞান আছে বলে পালায়। একটি জ্যান্ত পিপীলিকা আগুনের তাপ বোধ করলেই পালায়, মৃত পিপীলিকা পালায় না। জ্যান্ত সাপ বা পিপীলিকার মধ্যে আত্মা আছেন বলে ভাল-মন্দের জ্ঞান থাকে। সুতরাং যেখানে আত্মা সেখানে জ্ঞান। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম।

তত্ত্বমসি

(ছান্দোগ্য উপনিষদ- সামবেদ)

তত্ত্বমসি। অর্থাৎ তৎ- ত্বম- অসি। তুমিও সেই। সেই কি? সেই ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি বাক্যটি বেরিয়েছিল উদ্দালক আরুণির কণ্ঠে। ঋষি আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছিলেন।

সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বাক্যটি নয় বার উচ্চারিত হয়েছে। পুত্রকে আত্মতত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে আরুণি বাক্যটি পর পর নয় বার ৮ম থেকে ১৬শ খণ্ডে উচ্চারণ করেছেন। সামান্য দু/একটি শব্দের সংযোজন বিয়োজন বাদ দিলে বাক্যটি একই। তা হচ্ছে-

'স য এষোঽনিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং
তৎ সত্যংস আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান
বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥'

বঙ্গানুবাদ- সেই যে সূক্ষ্ম (কারণ) তাঁরই দ্বারা এই সমস্ত জীবন আত্মবান। তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু তুমিও সেই সৎ স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম।

উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে সৎস্বরূপ (ব্রহ্ম) বলছেন। এখানে শ্বেতকেতু ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের প্রতীক হিসেবে গণ্য। সুতরাং সকল জীবই তত্ত্বত সৎস্বরূপ (ব্রহ্ম)। শ্বেতকেতু কে? দেহ না আত্মা? এখানে দেহস্থিত আত্মাকেই শ্বেতকেতু বলা হয়েছে। জগতের জীব তত্ত্বত সৎ বলতে বুঝতে হবে জীবের আত্মা তত্ত্বত সৎ। দেহ নয়। দেই বিনাশশীল। দেহের মধ্যে যতক্ষণ আত্মা বিরাজ করেন ততক্ষণ দেহে চৈতন্য থাকে। মানুষ দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে জানে না। তাই দেহকেই মনে করে শ্বেতকেতু বা আমি। এ মহাভ্রান্তি। এই ভ্রান্তিতেই সাধারণ মানুষের জীবন কাটে। উদ্দালক আরুণি পুত্রকে এই ভ্রান্তি থেকে সত্যে নিয়ে যাবার জন্যেই নানা উপমা সহকারে বার বার বলছেন তত্ত্বমসি (তুমিই সেই পরম সত্য ব্রহ্মা)।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি উদ্দালক আরুণি। আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু বার বছর বয়সে গিয়েছিলেন গুরুগৃহে

বেদাধ্যয়নের জন্য। আরও বার বছর বেদাধায়ন করে চব্বিশ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে এলেন। পুত্রকে দেখে পিতা আরুণির মনে হল পুত্র খুব দাম্ভিক ও বিদ্যাভিমানী হয়ে উঠেছেন। পিতা জিজ্ঞেস করলেন শ্বেতকেতু সেই বিষয়টি জেনেছিলে কি যা জানলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়। শ্বেতকেতু বললেন 'সে আবার কিরূপ?' আরুণি নানা উপদেশ দিয়ে পুত্রকে বুঝিয়ে দিলেন। যেমন সকল মৃন্ময় পাত্রই মাটি দিয়ে তৈরি। তাই মাটিকে জানলে সকল মৃন্ময় পাত্রই জানা হয়ে যায়। অথবা সকল স্বর্ণালঙ্কারই স্বর্ণ দিয়ে তৈরি, তাই স্বর্ণকে জানলে সকল স্বর্ণালঙ্কারই জানা হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ একটি সত্তা আছে যাঁকে জানলে জগতের সবকিছু জানা হয়ে যায়। সেই সত্তাটি কি তা জানতে চাইলে। পিতা বললেন সেই বস্তুটি সৎ। সেই সৎ থেকেই এই জগৎ (তাঁরই ইচ্ছায়) সৃষ্টি হয়েছে। সেই 'সৎ' হলেন পরমাত্মা। সকল জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে এসেছে। তিনিই সকলের মূল।

উদ্দালক আরুণি কী কী উপমা উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করলেন যে শ্বেতকেতু (জগতের সকল জীব) সৎ, তা আমরা ক্রমান্বয়ে আস্বাদন করব।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডে দেয়া হয়েছে সুষুপ্তির (গভীর ঘুম) উপমা। 'অন্তঃকরণ দর্পণে' প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। দর্পণ অপসৃত হলে 'প্রতিবিম্বটি যেমন মুখরূপেই অবস্থান করে তেমনি সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হলে জীব নিজের স্বরূপ সদ্রূপেই অবস্থান করে। এটি আত্যন্তিক মুক্তি নয়, কারণ এই অবস্থাতেও কর্মবীজ অবশিষ্ট থাকায় জীব পুনরায় ফিরে আসে।' এ ঠিক যেন সূতায় বাঁধা পাখির মত। সূতায় বাঁধা পাখি সূতার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে আবার যেমন বন্ধন স্থানে ফিরে আসে জীবও তেমন আত্মায় ফিরে আসে। এই আত্মই সব। দেহে আত্মা থাকলে চৈতন্য থাকে। চৈতন্য থাকলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাক্য, মন, তেজ সব থাকে। এই সূক্ষ্ম আত্মাই জীব। দেহ জীব নয়। এই সূক্ষ্ম আত্মার বিনাশ নেই, তা শাশ্বত সত্য ব্রহ্মা স্বরূপ। শ্বেতকেতু সেই সত্য। জগতের জীব মাত্রই সেই সত্য। সুষুপ্তিকালে জীব সৎস্বরূপে অবস্থান করেও নিদ্রা ভঙ্গের পর সে আর বলতেই পারে না যে সে সেই সত্য। এ ঠিক যেন মধু চক্রের মধুর মত। মধু মক্ষিকা নানা ফুল থেকে রস এনে মধুচাক ভরে তোলে। মধু চাকে এসে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের রস আর জানেই না কে কোন ফুলের মধু। ভিন্ন ভিন্ন নদীপথে প্রবাহিত হয়ে জল এসে সমুদ্রে পতিত হয়। সমুদ্রে এসে সকল জলই সমুদ্রের জল। কেউ বলতে পারে না আমি অমুক নদীর। ঠিক তেমনি হাতি, বাঘ, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, কীট, পতঙ্গ সকলেই সুষুপ্তিকালে সৎস্বরূপে অবস্থান করলেও নিদ্রাভঙ্গের পর আর জানে না যে সে সৎ। কিন্তু তত্ত্বত তারা প্রত্যেকেই সৎ, তত্ত্বমসি।

একটি বৃক্ষের মূলদেশে আঘাত করলে রস নির্গত হয়। বৃক্ষের মধ্য দেশে বা উর্ধ্বদেশে আঘাত করলেও রস নির্গত হয়। এর ভেতরে চৈতন্য স্বরূপ জীবাত্মা আছেন বলেই রস নির্গত হয়েও বৃক্ষটি বেঁচে থাকে। কিন্তু বৃক্ষের একটি শাখা ছেদন করলে ঐ শাখাটি শুকিয়ে যায়। কারণ জীবাত্মা ঐ শাখাকে পরিত্যাগ করেন। সমগ্র বৃক্ষটিকে ছেদন করলে বৃক্ষটিই শুকিয়ে যায়। কারণ জীবাত্মা বৃক্ষটিকে পরিত্যাগ করেছেন। ঠিক তেমনি জীবাত্মা দেহটিকে পরিত্যাগ করলে দেহ মরে যায়। আত্মা মরেন না। তাই জীব দেহ নয়, আত্মা শ্বেতকেতু, তুমি আমি সকলেই তত্ত্বত আত্মা। তত্ত্বমসি।

সূক্ষ্ম আত্মা থেকেই এই স্থূল জগতেন উৎপত্তি।

আরুণি শ্বেতকেতুকে সম্মুখস্থিত একটি বিরাট বটবৃক্ষ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– এটি কী দেখছ? শ্বেতকেতু- বটবৃক্ষ।

আরুণি- আর কী?

শ্বেতকেতু- আর তো কিছু নেই।

আরুণি- বৃক্ষে যে ছোট ছোট ফল ধরেছে, তা দেখছ?

শ্বেতকেতু-আজ্ঞে দেখছি।

আরুণি- একটি ফল পেড়ে আন তো। শ্বেতকেতু ফল পেড়ে আনলে আরুণি বললেন, ফলটি ভাঙো তো? শ্বেতকেতু ফল ভাঙলে পর আরুণি জিজ্ঞেস করলেন- এখন কী দেখছ?

শ্বেতকেতু- অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ। আরুণি পুত্রকে একটি ক্ষুদ্র বীজ ভাঙতে বললেন। শ্বেতকেতু একটি বীজ ভাঙলে পর আরুণি জিজ্ঞেস করলেন- এবার কী দেখছ?

শ্বেতকেতু- অতি সূক্ষ্ম আঁশ।

আরুণি- এখন কী ভাবছ?

শ্বেতকেতু- কিছু না বাবা।

আরুণি - এই সূক্ষ্ম আঁশ থেকে বের হতে পারে একটি অঙ্কুর। সেই অঙ্কুর বড় হয়ে পরিণত হবে আরেকটি বিরাট বটবৃক্ষে।

এভাবেই সূক্ষ্ম আত্মা থেকে স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়। শ্বেতকেতু শ্রদ্ধাবান হও।

শ্রদ্ধাবান না হলে শুধু পাণ্ডিত্য অভিমান দিয়ে এই আত্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। শ্বেতকেতুসহ আমরা সকলে সেই সূক্ষ্ম আত্মা (তত্ত্বমসি)। স্থূলদেহ নই।

এই স্থূল জগৎ সূক্ষ্ম আত্মাকে ধারণ করে আছে অথবা সূক্ষ্ম আত্মা স্থূল জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এবার পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে একখণ্ড সৈন্ধব লবণ (Rock salt) এবং এক পাত্র জল আনতে বললেন। শ্বেতকেতু তা আনল। পিতা বললেন লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করে রেখে দাও। আগামী কাল নিয়ে এস। পরদিন সকালে শ্বেতকেতু জলপাত্র নিয়ে পিতার নিকট এসে বললেন- লবণখণ্ড কোথাও নেই। লবণখণ্ড জলপাত্রে নেই। এবার পিতা বললেন, ঐ পাত্রের উপর মধ্য ও তলদেশ থেকে জল পান কর। শ্বেতকেতু জলপান করল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগছে? শ্বেতকেতু বলল - লোনা। এবার পিতা বললেন- লবণ গলে পাত্রের জলে মিশে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জল পান করলেই লবণের মিশে যাওয়া অনুভব করা যাচ্ছে। ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম আত্মা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুভব করা যায়। এই দেহ মধ্যেই তিনি আছেন। তাই তুমি তিনিই। তত্ত্বমসি।

কোন ব্যক্তিকে যদি দু'চোখ বেঁধে গভীর অরণ্যে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, লোকটি চিৎকার করে করে এদিক ওদিক ইতস্তত বিচরণ করবে। সে জানে না, সে কোন দিকে এসেছে, কোথায় এসেছে। আমরা জগতের বদ্ধজীবেরাও ঠিক ঐ চোখ বাঁধা লোকটির মতো। আমরা জানি না কোত্থেকে এসেছি আর আমরা কে?

কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি চোখ বাঁধা লোকটিকে বলে দেন যে আপনাকে দুর্বৃত্তরা অমুক পর্বতে এনেছে। আপনি ঐ পথে অগ্রসর হলে আপনার দেশে (মনে করুন অমুক দেশে) যেতে পারবেন। লোকটি তখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিজ্ঞেস করতে করতে বাড়ি যেতে পারবে। ঠিক তেমনি জগতের আবদ্ধ লোক আমরা সদ্‌গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে জ্ঞান লাভ করে জানতে পারি যে আমরা সৎ। আমরা এভাবে 'তত্ত্বমসি' এর সত্যে উপনীত হতে পারি। এ সত্যে উপনীত হলেই ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

রোগাক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের পাশে বসে তাঁর জ্ঞাতি বন্ধুগণ জিজ্ঞেস করে 'আমাকে চিনতে পারছ?' যতক্ষণ তার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ আত্মায় লীন না হয় ততক্ষণ সে চিনতে পারে। কিন্তু যখন লীন হয়ে যায় তখন আর চিনতে পারে না।

বিদ্বান (ব্রহ্মজ্ঞ) আর অবিদ্বান (অব্রহ্মজ্ঞ) উভয়ের মৃত্যু একই রূপ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ সৎস্বরূপের জ্ঞানে পরমাত্মায় লীন হন। তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। অবিদ্বান পুনর্জন্ম লাভের ফলে আবার ফিরে আসেন। সুতরাং আত্মজ্ঞান মুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক।

'তত্ত্বমসি' বাক্যটি ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য। এই মহাবাক্যের প্রবক্তা উদ্দালক আরুণি ছান্দোগ্য শ্রুতির সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। এই বাক্যটিকে মহাবাক্য আখ্যায়িত করেছেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশ ষষ্ঠ প্রপাঠক। কারণ এই অংশে তত্ত্বমসি মন্ত্রটি রয়েছে। সমগ্র মন্ত্রটি হচ্ছে- স যঃ এষোহনিমা ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। অর্থাৎ সেই যিনি এই অনিমা এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক, সেই অনিমা সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিও সেই।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য তাঁর ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ করেছেন।

- তৎ ত্বমসীতি। তুমি তাহাই (ব্রহ্ম)। জগদ্‌গুরু তাঁর তত্ত্বোপদেশে তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন।'জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অভিন্ন' এই সত্য শঙ্কর তত্ত্বমান বাক্যে দেখেছেন। 'তৎ' শব্দ বাচ্যার্থে ব্রহ্ম কিন্তু লক্ষ্যার্থে শুদ্ধ চৈতন্য। ত্বম্ শব্দ বাচ্যার্থে শ্বেতকেতু এবং লক্ষ্যার্থে শুদ্ধ চৈতন্য। সুতরাং তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অর্থাৎ তত্ত্বমসি মানে জীব ব্রহ্মৈব নাপর।

দ্বৈতবাদীরা তত্ত্বমসি এর ব্যাখ্যা করেন তস্য ত্বম। তুমি তাঁর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে তত্ত্বমসি মানে তুমি তাঁই দাস। যাই হোক ছান্দোগ্যের তত্ত্বমসি বাক্যটি যে একটি অপূর্ব বাক্য এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

অহং ব্রহ্মাস্মি

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ-যজুর্বেদ)

অহং ব্রহ্মাস্মি। আমি ব্রহ্ম। আমি আত্মা। দেহ আমার। ঘরটি যেমন আমার, বাড়িটি যেমন আমার, দেহটিও তেমনি আমার।

এটি আমি নয়। আত্মাটি আমি। আত্মা তো একটিই। এক আত্মাই সকল জীব হৃদয়ে বিরাজমান। সুতরাং আমার আত্মা আর তোমার আত্মা দুটি নয়, একটিই। আমার আত্মা আর তোমার আত্মা যদি হয় একটিই তাহলে তুমি আর আমি অভিন্ন। এক আত্মা থেকে সমস্ত জগতই সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তো আমি আর জগত অভিন্ন। বিশ্বের প্রতিটি জীবই আমি। এ অবস্থা লাভ করাকে বলা হয় সর্বাত্মক হওয়া। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

'জগত আসে প্রাণে জগতে যায় প্রাণ।'

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উপনিষদের এ এক অপূর্ব অনুভূতি। এ অনুভূতি যার হয়েছে তিনি পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সঙ্গে একীভূত। একেই বৃহদারণ্যক বলেছেন অমৃত (হওয়া)। যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্যাম। যা দ্বারা আমি অমৃত হতে পারবো না তা দ্বারা কী করব?'

বৃহদারণ্যকের প্রধান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাসে যাবেন। স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পদ দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীকে ভাগ করে দেবেন। মৈত্রেয়ী বললেন, এ সম্পদ পেয়ে কি তিনি অমৃত হতে পারবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না।' তখন মৈত্রেয়ী বললেন 'যা দ্বারা আমি অমৃত হতে পারবো না তা দ্বারা কী করবো?' বিদ্যোদয়ের পূর্বে জীব ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি আপনাকে জানলেন, অহং ব্রহ্মাস্মি। আমিই ব্রহ্ম। এর ফলে তিনি সর্বাত্মক হলেন। দেবগণের মধ্যে, ঋষিগণের মধ্যে বা মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁরাই জ্ঞান লাভ করেন তাঁরাই এরূপ সর্বাত্মক হন।

এই পরম জ্ঞাতব্য খোসাহীন ব্রীহিবৎ হৃদয়স্থিত আত্মা বুদ্ধিতে উপস্থিত এবং ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যেও উপস্থিত। তিনি মহান জন্মরহিত পরমাত্মাই। আমার হৃদয়স্থিত হয়েও তিনি আমারও নিয়ামক এবং সমগ্র বিশ্বেরও নিয়ামক। জীবহৃদয়ে থেকে তিনি জীবের নিয়ামক কিন্তু জীব তাঁকে জানে না। হৃদয়স্থিত আত্মা সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর ও সকলের অধিপতি। ব্রাহ্মণগণ নিত্য স্বাধ্যায় যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও রাগদ্বেষরহিত হয়ে এই আত্মাকে জানতে ইচ্ছা করেন। তারা এই আত্মাকে জেনেই মুনি হন। পরিব্রাজকগণ এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন। যাঁদের নিকট আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সন্তান, বিত্ত বিষয় ও পাণ্ডিত্য কিছুই কামনা করেননি। পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ত্যাগ করে তাঁরা জীবিকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতেন। এই আত্মাকে নেতি নেতি দ্বারা অন্বেষণ করতে হয়।

এই আত্মতত্ত্বকে জানলে মানুষ পাপে লিপ্ত হয় না। আত্মজ্ঞানী সদা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন। পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। রাজর্ষি জনক প্রশ্ন তুললেন, 'কতম আত্মেতি' আত্মা কোনটি। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'এই যিনি বৃদ্ধিতে উপস্থিত, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে উপস্থিত এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিপুরুষ তিনিই আত্মা। এই আত্মা শরীর ধারণকালে দেহেন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত হন। এবং মরণকালে দেহেন্দ্রিয় ত্যাগ করেন। আত্মা দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন বটে। কিন্তু তিনি দেহীর পাপপুণ্য ভোগ করেন না। সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করেন মাত্র। তিনি দেহাভ্যন্তরে আছেন কিন্তু তিনি দেহ থেকে আলাদা। তিনি দেহীকে নিয়মিত করেন কিন্তু দেহী তাঁকে জানে না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে দেহ দুর্বল হয়। ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমে ক্রমে আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়। চোখ একীভূত হলে লোকটি দেখে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় একীভূত হলে আর আঘ্রাণ করতে পারে না। এভাবে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় আত্মায় একীভূত হয়ে যায়। হৃদয়ের নিষ্ক্রমণ দ্বারা তখন সমুজ্জ্বল হয়। ব্রহ্মরন্ধ্র বা অপর দেহাবয়বের ভেতর দিয়ে জীবাত্মা ঐ জ্যোতি অবলম্বন করে নিষ্ক্রান্ত হন। তিনি উৎক্রান্ত হলে প্রাণ উৎক্রমণ করে। প্রাণ উৎক্রমণ করলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়। তখন জীব বিশেষ বিজ্ঞানবান হন এবং পরে উক্ত বিশেষ বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত দেহান্তরকে প্রাপ্ত হন। বিদ্যা ও কর্মের ফল এবং অতীত সংস্কার তাঁর সঙ্গে গমন করে।

এই যে আত্মা আমার হৃদয়ে আছেন তিনি অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়। তিনি ব্রহ্ম। তাই আমিই ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি। এই পরম সত্য জানাই অমৃতত্ত্বের সাধন।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ- অথর্ববেদ)

অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মা মানে কোন আত্মা? আত্মা তো একটিই। একই চাঁদ ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হলে যেমন মনে হয় যত জলাশয় তত চাঁদ, ঠিক তেমনি একই আত্মা অগণিত জীব হৃদয়ে অবস্থান করায় মনে হয় যত জীব তত আত্মা। বস্তুত চাঁদ যেমন একটি, আত্মাও একটি।

অথর্ববেদান্তর্গত মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলছেন সর্বমদহ্যেতদ ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। সোহয় মাত্মাচতুষ্পাদ।

অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। উক্ত আত্মা চতুষ্পাদ। অন্য ভাবে বলা যেতে পারে আত্মার চার অবস্থা-জাগ্রত,

স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও দেহ জাগ্রত। তখন আত্মা বাহ্য বিষয়ে সচেতন বা বহিঃপ্রজ্ঞ। জাগ্রতাবস্থা আত্মার ভোগ স্থান। তখন তার সাতটি অঙ্গ ও উনিশটি মুখ। যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ।

স্বপ্নাবস্থা আত্মার দ্বিতীয় পাদ। এই অবস্থায় আত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ। তখন তিনি শুধু বাসনাই ভোগ করেন। এই অবস্থায়ও আত্মার সাতটি অঙ্গ এবং উনিশটি মুখ। অন্তঃপ্রাজ্ঞে ভোগকারী তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

যে অবস্থায় কোন কাম্য থাকে না কোন স্বপ্ন দেখা যায় না তাই সুষুপ্তি, সুষুপ্তিতে আত্মা স্থিত, সর্ববিক্ষেপ রহিত। অনুভূতিস্বরূপ এবং আনন্দময়। আনন্দময় সেই প্রাজ্ঞই আত্মার তৃতীয়পাদ। এই অবস্থায় আত্মা সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, উপাদান কারণ এবং ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। এটিই আত্মার তৃতীয়পাদ। সুষুপ্তিই তৃতীয় পাদ।

সুষুপ্তির পর আত্মা অদৃশ্য, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য। তখন তিনি প্রাজ্ঞ নহেন, জড় নহেন, তিনি আত্মা, কেবল আত্মা। তিনি শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়। এটিই তুরীয় অবস্থা। এটি আত্মার চতুর্থ পাদ। তুরীয় অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। পূর্ণ অনুভবও হয় না। এ আংশিক অনুমেয় মাত্র। এই স্তর লব্ধ আত্মার যে তুরীয় আনন্দ তা তাঁর পক্ষেই অবর্ণনীয়।

তুরীয় আত্মার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাণ্ডুক্যশ্রুতি ৭ম মন্ত্রে বলছেন-

নান্তঃ প্রজং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং।
অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-
দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতমং চতুর্থমন্যন্তে।
স আত্মা। স বিজ্ঞেযঃ। (মাণ্ডুক্য উঃ-৭)

অর্থাৎ তুরীয় অবস্থায় আত্মা অন্তঃপ্রাজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞও নহেন। উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়ও নহেন। সর্ব বিষয়ের জ্ঞাতা নহেন, জড়ও নহেন। এ অবস্থায় আত্মা অদৃশ্য অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য ও অনির্দেশ্য। তিনি কেবল আত্মা-শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়। এই আত্মাকেই জানতে হবে।

এই চতুর্থ পাদ বা তুরীয় অবস্থা আত্মার সর্বোত্তম অবস্থা। এখানে আত্মা স্বরূপাবস্থায় প্রকটিত। তখন আত্মা পরমাত্মা একীভূত। এই অবর্ণনীয় অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে মাণ্ডুক্য উপনিষদ অনেকগুলো অভাববাচী বিশেষণ দিতে দিতে শেষে তিনটি ভাববাচী বিশেষণ দিয়েছেন- শান্ত, শিব ও একাত্মপ্রত্যয়সার।

নিচে মাণ্ডুক্যে ব্যবহৃত বিশেষণগুলোর অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা গেল।

আত্মার অভাববাচী বিশেষণ

নান্তঃ প্রজ্ঞম্- তৈজস নহেন। অর্থাৎ অন্তর্জগতের কোন অনুভব নেই। অন্তরিন্দ্রিয় ক্রিয়াহীন।

ন বহিঃপ্রজ্ঞম্-বহির্জগতের অনুভব নেই। বহিরিন্দ্রিয় ক্রিয়াহীন।

নোভয়তঃ প্রজ্ঞম - অন্তর-বাহির মিলিত কোন অনুভব নেই।'

ন প্রজ্ঞানঘনম্ - ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ কোন জ্ঞান নেই।

ন প্রজ্ঞম/নাপ্রজ্ঞম্ - সর্বজ্ঞ নহেন।

অগ্রাহ্যং-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন।

অদৃষ্টম্ - তাঁহার দৃষ্টান্ত স্বরুপ কিছু নেই।

অলক্ষণম্ - অনুমান প্রমাণ-গ্রাহ্য নয়।

অব্যপদেশ্যম্ -শব্দ প্রমাণের বিষয় নয়।

অব্যবহার্যম্ - আত্মা সদৃশ কিছুই না থাকায় উপমান প্রমাণযোগ্য নয়।

অচিন্তম্ - সর্ববিধ চিন্তার অতীত।

প্রপঞ্চোপশমম্ - জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত।

আত্মার ভাববাদী বিশেষণ:

শান্তম - অবিক্রিয়।

শিবম্-মঙ্গলময়।

অদ্বৈতম্ - আত্মার দ্বিতীয় কিছু নেই।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান মাণ্ডুক্যের প্রথম তিন স্তর বর্ণনা করেছেন। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের ভাষায় জাগ্রত অবস্থাকে বলা হচ্ছে সচেতন (concious) স্বপ্নকে বলা হচ্ছে অবচেতন (sub-concious) আর সুযুপ্তিকে অচেতন (unconcious)। মনস্তত্ত্ব মাণ্ডুক্যের তুরীয় অবস্থার সন্ধান এখনও লাভ করতে পারে নি। মনস্তত্ত্ব 'মন' নিয়ে চিন্তা করে। তাই মনস্তত্ত্বের মতে এই তিন অবস্থা মনের।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ ষষ্ঠ মন্ত্রে বলছেন,

এষ সর্বেশ্বর, এষ সর্বজ্ঞ এবোন্তর্যামী।
এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম।

এই প্রাজ্ঞ আত্মা সকলেরই ঈশ্বর। তিনি সকলের অন্তরে থেকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি এই জগতের প্রসবক্ষেত্র। এ থেকে সকল প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহাতেই লয় হয়।

ঋষি দৃষ্টিতে আত্মার তিন অবস্থা- স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল জাগ্রত অবস্থা, সূক্ষ্ম স্বপ্নাবস্থা আর কারণ সুষুপ্তি। জাগ্রতাবস্থায় আত্মা স্থূল জগতকে ভোগ করেন, স্বপ্নাবস্থায় সুক্ষ্ম জগৎ ভোগ করেন আর সুষুপ্তিতে আত্মা আনন্দভুক। স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ এই তিন অবস্থাই আত্মার উপাধি। উপাধিহীন কোন প্রকার আবরণহীন অবস্থাই তুরীয় আত্মা। অতএব আত্মাই ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম। মাণ্ডুক্যোপনিষদ প্রথম মন্ত্রেই বলেছিলেন ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম।

এই সমস্তই 'ওম' এই অক্ষরাত্মক। জগতের সমস্তই আত্মা। সুতরাং আত্মাও অক্ষরাত্মক। প্রণব বা ওঙ্কার আত্মা থেকে অভিন্ন। ওঙ্কার মাত্রারূপে বর্তমান। আত্মার পাদসমূহই প্রণবের মাত্রা। অকার, উকার ও মকার এরাই প্রণবের মাত্রা। অকার আত্মার জাগরিত স্থান। উকার স্বপ্ন স্থান আর মকার সুষুপ্তি স্থান। মাত্রাহীন ওস্কার তুরীয় স্থান। যিনি আত্মাকে এইভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি স্বয়ং পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। তিনি মুক্ত। সুতরাং আত্মাই ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

উপসংহার : বেদের চার মহাবাক্যে: ১. প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ২. তত্ত্বমসি ৩. অহং ব্রহ্মাস্মি ৪. অয়মাত্মা ব্রহ্ম (১. প্রজ্ঞান ব্রহ্ম ২. তুমি ব্রহ্ম ৩. আমি ব্রহ্ম ৪. এই আত্মা ব্রহ্ম) মূলত একই তাৎপর্য বহন করে। তা হচ্ছে 'জীব মাত্রই ব্রহ্ম'। এই তত্ত্বটিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুনতিষ্ঠতি।' (শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৮/৬১) ঈশ্বর সকল জীবহৃদয়ে অবস্থান করছেন, অর্জুন। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম যেন অগ্নি আর জীবাত্মা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। নির্বাচিত চারটি বেদবাক্য যে চরম এবং পরম সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বেদের এই তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রও স্বীকার করেন। তবে অন্যভাষায়। উপনিষদ যাকে বলছেন পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম, তন্ত্র তাঁকে বলছেন মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই প্রতিটি জীবহৃদয়ে শক্তিরূপে বিরাজ করছেন। আমার মাঝে শক্তি আছেন বলে আমি কথা বলতে পারছি, হাঁটতে, বসতে আর ভাল-মন্দ কত কাজ করতে পারছি। এই শক্তির বলেই প্রতিটি জীব খেতে, চলতে পারছে। শক্তি নিষ্ক্রান্ত হলে দেহ নিষ্ক্রিয়। শক্তি হতে জীবের সৃষ্টি, শক্তির অবস্থানে জীবের স্থিতি আর শক্তির নিষ্ক্রমণে জীবের মৃত্যু– এ গেল তন্ত্রের কথা। বেদান্ত সূত্র বলছেন– 'জন্মাদস্য যতঃ। পরমব্রহ্ম থেকে সকলের সৃষ্টি, ব্রহ্মে স্থিতি আর ব্রহ্মেই লয়।' হৃদয়াকাশ– থেকে ব্রহ্ম আত্মা নিষ্ক্রান্ত হলেই মৃত্যু। সুতরাং আত্মা যে ব্রহ্ম এবং তুমি আমি ও সকল জীবই যে তত্ত্বত সেই আত্মা বা ব্রহ্ম তা স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এ তো অতি পুরাতন কথা। এর সঙ্গে আরেকটি পুরাতন কথা বেদ থেকেই আবিষ্কার করলেন আচার্য শঙ্কর। কথাটি হলো- তুমি, আমি ও প্রতিটি জীবই তত্ত্বত ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সুতরাং আমরাও সত্য। যে বাক্যগুলো দ্বারা জীব এত উচ্চে উঠে গেল সেগুলো মহাবাক্য বা মহামন্ত্র তো বটেই।

বৈষ্ণবাচার্যদের অনেকেই আচার্য শঙ্করের নির্বাচিত এই চারটি বাক্যকে মহাবাক্য বলে স্বীকার করেন না। তবে বেদের এই বাক্যগুলো যে মহামূল্যবান তা অস্বীকার করেন না। মহাবাক্য স্বীকার না করার কারণ সম্ভবত- আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। এই মহাবাক্যগুলো নানা গ্রন্থে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্কর তাঁর অদ্বৈতবাদকে সাবলীল করে তুলেছেন। বৈষ্ণবাচার্যরা দ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদের শক্ত হাতিয়ারকে তো তাঁদের মতো করে গ্রহণ করবেনই না। এতো খুবই স্বাভাবিক। দ্বৈত, অদ্বৈতের বাদাবাদীতে না গিয়ে বাক্য চারটির রসাস্বাদনে আমরা মুগ্ধ। আমরা জগদগুরুর 'ব্রহ্ম সত্য' 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বাক্যাংশ দুটির প্রসঙ্গ আনলেও 'জগৎ মিথ্যা' কথাটি কোথাও বলিনি। উপনিষদ নিজেই বলেছেন–

তমৈবেকং জানথ আত্মানম অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈয সেতুঃ
আত্মাকে ধর অন্য কথা ছাড়। অমৃতত্ব লাভের এ সেতুই দৃঢ়।

লেখক : প্রফেসর, সাহিত্যিক ও বাগ্মী। সভাপতি, শ্রীশ্রীশচী অঙ্গন ধাম পরিচালনা পরিষদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম: একটি আধুনিক অধ্যয়ন

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

॥১॥

মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মমত এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বৈষ্ণবদের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার তৎকালীন বাঙালির জীবনকে যেমন, তেমনিভাবে বর্তমানকালের বাঙালি হিন্দুর জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। মোহমুক্ত হয়ে ঐতিহাসিক বিবেচনাকে সামনে রেখে এই অধ্যাত্ম ভাবান্দোলনকে জানতে হবে।

॥২॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের সময় থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাব বিস্তারিত হতে থাকে। পঞ্চোপাসনার অন্যতম এই বৈষ্ণব মতবাদ।[১]

দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব মতের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ভাবধারা কোনভাবেই যুক্ত ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনায় রূপলাভ করেছে। অনেক জটিল গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে এ বিষয়ে, সেই সব গ্রন্থ দু'দিকে আলো ফেলেছে। একটি তত্ত্বের দিক– অন্যটি রসের দিক। দুটি ধারাকেই বুঝতে হবে।

গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত- বাংলাদেশে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচলিত হয়েছে নানা শিলালিপি ও তাম্রশাসনে তার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐতিহ্য ধারায় প্রথমে এ মত প্রবাহিত হয়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণেরা শৈব শাক্ত ধর্মকে কটাক্ষ করলেও বৈষ্ণব মত মেনে নেন।[২] বৈষ্ণবদের আচরিত অহিংসা ও সদাচারকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন। রামানুজাচার্য বৈষ্ণব বৈদান্তিক চিন্তাকে প্রকাশ করেন 'বিশিষ্টদ্বৈতবাদ'- নামে, দর্শন তত্ত্ব প্রচার করেন তবে একজন গবেষক বৈষ্ণবীয় এ অহিংসাকেই দায়ী করছেন হিন্দু সভ্যতার অবক্ষয়ের জন্য। সি.ভি. বৈদ্য ও কে.এম. পানিক্করকে স্মরণে করা যায় এ প্রসঙ্গে।[৩]

গৌরসুন্দরের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ছিল অবধারিত। খাদ্য বিচার, তন্ত্র অনুসরণ ও প্রচলিত আচরণের তাঁরা বিদ্রোহী ছিলেন। বৈষ্ণব মত সামাজিক শুদ্ধতার জন্যে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে এই ধর্ম আন্দোলন গণধর্মের মর্যাদা পায়। ব্যাপকভাবে বাঙালি জীবন ও কৃষ্টিকে এই চৈতন্যের মতাদর্শ ও জীবনাচরণ প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে তাঁর জীবন-সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি আমাদেরকে খুব সহায়তা করে; কারণ দেবতাকে বাদ দিয়ে শুধু রক্তমাংসে গড়া, মর্ত্য মানুষের জীবনকথা চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে। যা সংখ্যায়ও অনেক।[৪] সে সময়কার বর্ণনা দিতে গিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন–

'জগত প্রমত্ত ধনপুত্র বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে ॥' (চৈ: ভাঃ প : ৩০)

সেই সমাজে ধর্মকর্ম কী ছিল, সে সম্পর্কেও তিনি সোচ্চার হয়েছেন–

'বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥'

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব নবদ্বীপে ব্যাপক ছিল। ফলে বৈষ্ণব মতকে অনেক সময় সমন্বয়ধর্মী হয়ে চলতে হয়েছে। তবু সে যুগের প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, অব্রাহ্মণকে গুরুপদবী দান, ভক্তিতে বর্ণাশ্রম রহিতকরণ, স্মৃতি শাসনের বাইরে গিয়ে সেবাধর্মের বিস্তার, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সাহিত্যে-সঙ্গীতে নতুন প্রকরণের বিস্তার বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকে মহিমামণ্ডিত করেছে। পুষ্পা নিয়োগী তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণিক সেটেলমেন্টস ইন ডিফারেন্ট সাবডিভিশনস অব এনসিয়েন্ট বেঙ্গল' বইতে (১৯৬৭) তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। নবদ্বীপ ছিল এক শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য উপনিবেশ। চৈতন্যের সমকালীন বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন তার সুবিখ্যাত 'অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি'– গ্রন্থে লিখেছেন শূদ্রের একমাত্র কৃত্য হলো- 'দ্বিজশুশ্রুষা'।[৫] স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদপাঠ অধিকার ছিল না। এ জন্যে দেখুন 'শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্বম্- পৃ- ৫০৪।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মবর্ণভিত্তিক সমাজে কীভাবে গৃহীত হয়েছিল। ড. বিমানবিহারী মজুমদারকে অনুসরণ করলে দেখা যায়, গৌরসুন্দরের ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ২৩৯ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন ছিলেন বৈদ্য, ২৯ জন ছিলেন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান, ১৬ জন স্ত্রীলোক।[৬] নবদ্বীপে যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ছিল, তার সিংহভাগ গিয়েছিল শ্রীহট্ট থেকে। তাদের নেতা ছিলেন অদ্বৈত। তিনি চৈতন্যমত প্রকাশে এক দ্রোহী ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণদাস লিখেছেন:

'শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নিহেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সব বৈষ্ণবের বলে ॥'

তিনি বিরুদ্ধ মতের কঠোর সমালোচক ছিলেন। জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের চেয়ে যে ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ প্রবক্তা। তাঁরা ভাগবত ও ভক্তি শাস্ত্রকে নির্ভর করে নতুন ভক্তিতত্ত্ব প্রচারে ছিলেন সদ্য তৎপর।[৭]

॥৩॥

শ্রীমদভাগবত হচ্ছে বৈষ্ণবদের সবচেয়ে প্রিয়গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়াও নারদভক্তিসূত্রম ও শাকিণ্ডল্যসূত্রম্[৮] এ বিষয়ে দু'টি প্রধান অবলম্বন। ভাগবতের ভক্তিতত্ত্বকে পৃথক সংকলন করেন বিষ্ণুপুরী 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' নামক গ্রন্থে।[৯] বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী লেখেন 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।' বিখ্যাত পণ্ডিত, মধুসূদন সরস্বতী লেখেন– ভগবদ্ভক্তি রসায়ন'। সবচেয়ে প্রণালিবদ্ধ আলোচনা শ্রীজীব গোস্বামীর 'ভক্তিসন্দর্ভ'। এসব গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে গভীর প্রত্যয়াতুর ভাষায়। যার সার সংক্ষেপ এভাবে দেখানো যেতে পারে–

১। ভক্তি হৃদয়ভিত্তিক। যুক্তিমূলক নয়।
২। ভক্তি সদাচারণমূলক।
৩। ভক্তি বর্ণাশ্রম মানে না।
৪। ভক্তিতত্ত্বে গুরুর বিশেষ স্থান।
৫। জ্ঞান ও ক্রিয়াকাণ্ডবিরোধী ভক্তি।

কয়েকজন ভক্তিবাদী বিশ্লেষকের ভক্তি বিশ্লেষণ করা যায়;

১। শ্রীধর স্বামীপদ বলেছেন–

'জ্ঞান ও কর্ম মাপা যায়, কিন্তু ও কৃষ্ণ নামের শক্তি মাপা যায় না'।

২। বাসুদেব সার্বভৌম বলেছেন–

'কণাদের দর্শন আমি পড়েছি। ন্যায়শাস্ত্র আমার জানা আছে। মীমাংসাও জানি, জানি সাংখ্য। যোগশাস্ত্রের সঙ্গেও আমি পরিচিত। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে বেদান্তের চর্চা করেছি। এ সবের কোনোটাই আমার চিত্তকে তেমন আকর্ষণ করে না। যেমন করে কোনো এক নন্দের ছেলের বাঁশরী বাদনের মাধুরী ধারা'। রূপ গোস্বামী সম্পাদিত 'পদ্যাবলী'[১০] তে এরকম অনেক 'পদ্য'- আছে যা ভক্তির স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম। তাই ভক্তিস্রোতই বৈষ্ণবভাব ধারাকে কল্লোলিত করেছে। শিব বিষও বহন করেন। অমৃতও বহন করেন।[১১] কারণ, তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। বাঙালির জীবনে এই অমৃত বিষের পাত্রখানি যিনি তুলে ধরেন, তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরসুন্দর। ভট্টাচার্য্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য ভক্তিকে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকল্পরূপে উপস্থাপিত করেন। বৈষ্ণবভক্তি ধর্মীয় ও সামাজিক অর্থে- সমাজ প্রগতির সহায়ক শক্তিরূপে উপস্থাপিত ও প্রচারিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে, যা পরবর্তী সময়ে এক ব্যাপক দার্শনিক মর্যাদা লাভ করেছিল।

এই ভক্তিতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেছিলেন উচ্চপদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা- যাঁরা প্রচলিত ভট্টাচার্য্যদের শাস্ত্রব্যাখ্যায় কোন নতুনত্ব খুঁজে পাননি। ভাগবত শাস্ত্রের নতুন টীকাভাষ্যে ভক্তির এক রসপ্রস্থানকে যাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁরাও ভক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণকথার মধ্যে রম্যকাহিনির ভেতরে তাঁরা ভক্তির নতুন ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ ছাড়া সম্পন্ন গৃহস্থ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও নতুনভাবে জীবন ভোগের তত্ত্বকে পেয়েছিলেন। ফলে ভক্তিবাদ দ্রুতই জন-জীবনে বিস্তার লাভ করে চৈতন্যমত-বোধিনী হয়ে উঠেছিল।

॥৪॥

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) বৈষ্ণব ধর্মকে ছড়িয়ে দিয়েছেন জগতের 'নগরাদি গ্রামে।' তিনি জনপ্রিয় কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে ভক্তিভাব ধারা প্রচার করেন। তাঁর আন্দোলনকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়–

১। তিনি নবদ্বীপে একটি বৈষ্ণবগোষ্ঠী সংগঠন করেন।
২। তিনি নাম প্রেম প্রচারের নতুন পন্থা কীর্তন প্রবর্তন করেন।

৩। নগর কীর্তনের মাধ্যমে জন-জাগরণ সৃষ্টি করেন।

৪। তিনি জাত বিচার ও অস্পৃশতা বর্জন করেন।

৫। বৈষ্ণব ভাবধারা প্রচারে নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

৬। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করে কিংবদন্তি সৃষ্টি করেন।

৭। মেধা ও মননে উৎকর্ষ সাহিত্য সৃজনের প্রেরণা দান করেন।

তাঁর প্রবর্তিত নামকীর্তন কোন সংকীর্ণ আচার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কয়েকটি কীর্তন-ঘরানা সৃষ্টিরও মূল উৎস ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন–

কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই
জ্ঞানে, কুলে, পাণ্ডিত্যে-চৈতন্য নাহি পাই (চৈ:ভা:প' : ১৯১)

শ্রীচৈতন্য বাংলা ভাষার পোষক ছিলেন। তাই তাঁর পরিকরগণ বাংলা ভাষায় জীবনী ও পদাবলি লিখে বাংলাচর্চাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সৃজিত সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলির উৎকর্ষ-বিভাষী গবেষকরা তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।[১২] চৈতন্য পার্ষদ অদ্বৈত আচার্য, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত ও গদাধর পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাব আন্দোলনে নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত চারটি বৈষ্ণব শাখার নাম পাওয়া যায়। পুরীতে শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত আচার্য ও অবধূত নিত্যানন্দকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অতিবৃদ্ধ অদ্বৈতের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ অদ্বৈতের অনুসারী বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ করেন। শান্তিপুরে তাঁর বংশ গোঁসাই বংশ নামে খ্যাত।[১৩] অদ্বৈতপন্থীদের মধ্যে লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস, বর্মমানের নবগ্রামের শ্যামদাস আচার্য ও ঢাকা জেলার তেওতা গ্রামে ঈশান নাগর সক্রিয় ছিলেন। প্রচারে সবচেয়ে ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। তিনি বারজন প্রধান পরিকরকে 'গোপাল' আখ্যা দিয়ে প্রচারে নিয়োজিত করেছিলেন।[১৪]

এই গোপালগণ ছিলেন চৈতন্যের দিব্যদূত। তাঁরা গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সাধারণজনের কাছে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছেন।

॥ ৫॥

বৈষ্ণবধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে বৃন্দাবনে ষড় গোস্বামী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। দুই ভাই, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর তাঁদের ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী, নিত্যানন্দের অনুচর সপ্তগ্রামের ধনীপুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কাশীর রঘুনাথ ভট্ট এবং দাক্ষিণাত্যের গোপাল ভট্ট বাংলাদেশের সফল প্রচারক ছিলেন সংসারী গৃহস্থ বৈষ্ণব। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর দুই গোস্বামী সংসারত্যাগী, রূপ-সনাতন ছিলেন মন্ত্রী। রঘুনাথ দাস 'চিড়া মহোৎসব'– করেছিলেন নিত্যানন্দের আদেশে। ছত্রিশ জাতিকে পংক্তিভোজনে বসিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। রঘুনাথ ভট্ট ভাগবত পাঠের এক অপূর্ব রীতি প্রচার করেছিলেন। গোপাল ভট্ট লিখেছিলেন বৈষ্ণব স্মৃতি 'হরিভক্তি বিলাস'। শ্রীজীব ছিলেন দার্শনিক। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম এক শক্তিশালী তত্ত্বরূপে প্রচারিত হয়। তবে একটি দুর্বলতা ছিল– কোন কেন্দ্রীয় তত্ত্ব ছিল না নিয়ামক হিসেবে। ফলে নানা স্থানে নানা আঞ্চলিক মত প্রাধান্য লাভ করে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। প্রধান সম্প্রদায়গুলি ছিল এ রকম:

১। অদ্বৈতপন্থী শিষ্য সম্প্রদায়।

২। নিত্যানন্দ সম্প্রদায়।

৩। শ্রীখণ্ডের গৌর নাগরবাদী সম্প্রদায়।

৪। গদাধর সম্প্রদায়।

৫। গৌরপারম্যবাদী সম্প্রদায়।

৬। বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্ত সম্প্রদায়।

বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ লিখেছেন তাকে একত্রে বলা হয় 'গোস্বামী-শাস্ত্র'। সেখানে কৃষ্ণতত্ত্বই প্রধান। বঙ্গদেশে নানা মতে প্রচারিত হয়েছে বৈষ্ণব ভাবগঙ্গা। গৌরনাগরবাদী'রা এক অশ্রদ্ধেয় যৌন চেতনাকে প্রকাশ করেছেন।[১৫] 'গৌরপারম্যবাদীগণ' শুদ্ধ চিন্তাকে প্রকাশ করেছেন।[১৬] বিষ্ণুপ্রিয়ার ভক্তরা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ভজনের দিকেও যেতে চেয়েছেন।[১৭] বৈষ্ণবদের এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না। বৃন্দাবনে ও বাংলাদেশে তত্ত্বগত ভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। গোস্বামী শাস্ত্র পথনির্দেশ করলেও পরতত্ত্ব নিয়ে রচিত হলো বিরোধী মত। অদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই

পরতত্ত্ব বলে ঘোষণা করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গোপীজনবল্লভকেই পরতত্ত্ব বলে প্রচার করলেন।

একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলাভাষায় এক অসাধারণ গ্রন্থ লিখে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শকে স্থাপন করলেন নিজের অলৌকিক মেধা, মনন ও কাব্যশক্তির দ্বারা। এমন সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ আর লেখা হল না।

॥৬॥

গৌরনিতাই ছিলেন প্রেমের অবতার। তাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রের বাইরে গিয়ে মানুষকে এক সমতলে ডাক দিয়েছিলেন প্রবল মানবিকতার টানে। আর বৈষ্ণব গোস্বামীরা বিরাট স্মৃতি রচনা করলেন ভক্ত মানুষকে শৃঙ্খলিত করার জন্যে। বৃহৎ আয়তনের 'হরিভক্তি বিলাস' নামক স্মৃতিগ্রন্থ অনেক নিয়ম কানুনের অচলায়তন সৃষ্টি করলো।[১৮]

রসবাদী গৌরহরি ছিলেন শুষ্ক জ্ঞানচর্চার বিরোধী। আর গোস্বামীরা সংস্কৃত ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদি লিখে সেই মতের বিপ্রতীপ কাজই করলেন। এক শ্রীজীব গোস্বামীপাদের রচনাই অসাধারণ মেধার স্থাপত্যে জ্ঞানবাদীদের সামনে রীতিমতো ভয়ের সঞ্চার করে। তাঁর ষটসন্দর্ভে যেভাবে গভীরতাস্পর্শী আলোচনা করা হয়েছে, তা লোকোত্তর প্রতিভা না থাকলে করা সম্ভব হতো না। বৈষ্ণব বেদান্ত-চর্চার এক জ্ঞানমূর্তি সাধক শ্রীজীব গোস্বামী। [১৯]

॥৭॥

মতে পথে বিভক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন তিনজন বৈষ্ণবচিন্তক বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী শাস্ত্র এনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন। তারা হচ্ছেন বর্ধমানের যাজী গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, রাজশাহীর খেতুরীর নরোত্তম দত্ত ও মেদিনীপুরের গোপীবল্লভ পুরের শ্যামানন্দ। তাঁদের প্রচেষ্টায় রাজশাহীর খেতুরীতে এক বিরাট বৈষ্ণব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত ১৬১০ সালে। ৯৫ জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্ত সশিষ্য এই সম্মেলন যোগদান করেছিলেন। ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে বৃন্দাবনের বড় গোস্বামীর মতাদর্শকেই গ্রহণ করা হয়।

॥৮॥

শ্রীচৈতন্য ভাব বিকাশের আরেকটি সুফল হলো নারীজাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, অদ্বৈত পত্নী সীতা দেবী ও নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ও শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী গুরু পদবী লাভ করেছিলেন। তাঁদের অনেক শিষ্য ছিল। সীতাদেবীর জীবনী সে যুগের এক মূল্যবান আখ্যান।[২০] জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনে ও সম্মানিতা হয়েছিলেন।

॥৯॥

বৈষ্ণব ধর্মমতের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন খ্যাতকীর্তি কিছু পণ্ডিতজন। বৈষ্ণবধর্ম বাঙালি ও উড়িয়াদের দুর্বল করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন যদুনাথ সরকার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।[২১] তবে তাঁরা কোন যথাযথ কারণ নির্দেশ করেননি। ঐতিহাসিক পানিক্কর অবশ্য বলেছেন আদি রসাত্মক কাব্য রচনা, শিল্পে মৈথুণ্য প্রদর্শন, ধর্মের নামে ব্যভিচার ইত্যাদি শোচনীয় অবক্ষয়কে ডেকে এনেছিল।[২২] সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও ড. সুশীল কুমার দে[২৩] তাঁদের বিখ্যাত বই দুটিতেও বৈষ্ণব ভাবতত্ত্বের প্রতি সুবিচার করেননি। সুশীল কুমার বৈষ্ণবদের নীতিহীনতার কথা সোচ্চার কণ্ঠে বলেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবন যাপনের সদাচার সম্পর্কে কিছুই বলেননি। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে যোগ্য বিবেচনাকে উপস্থিত করেছেন একজন গবেষক– তিনি কে. এল. দত্ত।[২৪] বৈষ্ণব মতে ভাবালুতা ছিল, তবে তান্ত্রিকতা প্রভাবিত যৌনাত্মক ভাবনা ছিল না।

॥১০॥

বৈষ্ণব ধর্ম নানা রসতত্ত্বের শৃঙ্খলে ও স্মৃতির নিয়মে আবদ্ধ হতে থাকলো। কীর্তনেও এল নানা শাস্ত্র নিয়ম। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকলো। ব্রাহ্মণ গোস্বামীরা আবার দখল করে নিলেন গুরুপদবী। অপ্রতিরোধ্য হলো তাঁদের গতি। জনগণের ধর্ম হয়ে গেল এক শ্রেণির পেশাজীবী ধর্ম-গোস্বামীর, শাস্ত্রের দাবিদার হলেন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতির ধারকরা। যে সমাজ-সাম্য ও উদার মানবিকতা মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন তা নষ্ট হয়ে গেল। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ আবার জায়গা করে নিল। ধনিক শ্রেণি ও রাজা জমিদার শ্রেণির হাতে পড়ে গেল এই গণধর্ম। শ্রীহট্টের রাজা দিব্য সিংহ, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেন। মণিপুর ও ত্রিপুরার রাজারাও বৈষ্ণব হলেন। ফলে জন-সাধারণ থেকে দূরে চলে গেল নিত্যানন্দ প্রচারিত ব্রাত্যজনের ধর্ম। ফলে নানা উপ-সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল নানা গুরুবাদী সম্প্রদায়ে। 'জাত বৈষ্ণব' বলে এক আলাদা শ্রেণি সৃষ্টি হলো। মহাপ্রভুর লোকধর্ম এখন অযোগ্য বোষ্টম বোষ্টমীদের দখলে চলে গেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী- দ্য বৈষ্ণব কাল্ট, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্স গোসাইটি, জুলাই- ১৯৩০
২। ভবতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত বল্লাল সেনের দানসাগর- কলকাতা-১৯৫৫
৩। সি.ভি. বৈদ্য- ডাউন ফল অফ হিন্দু ইন্ডিয়া- দিল্লী- ১৯৮৬
৪। ক. মণীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত- কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্' পানিহাটি- ১৯৭১
খ. মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত- মুরারী গুপ্ত- শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃতম্, কলকাতা- ১৯৪৫
গ. কৃষ্ণদাস কবিরাজ- শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কালনা- ১৯২৩
ঘ. জয়ানন্দ- চৈতন্যমঙ্গল, কলি- ১৯৭১
৫। বেণীমাধব দত্ত সম্পাদিত, রঘুনন্দন-অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি' শূদ্রাহ্নিকাচার তত্ত্বম- কলি- পৃ. ৫০৪
৬। বিমান বিহারী মজুমদার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উপাদান; কলি- ১৯৫৯
৭। বিনয় কুমার সরকার, বাংলা দেশি-বিদেশি, নবী সংস্কৃতির লেনদেন, কলি- ১৯৪২
৮। নন্দলাল সিনহা সম্পাদিত- ভক্তিসূত্রম অফ নারদ অ্যান্ড শাণ্ডিল্যসূত্রম- দিল্লি (তারিখ নেই)
৯। ক. ভাগবত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা
খ. টমাস জে, হপকিনস্, দ্যা সোসাল টিটিংস অফ দ্য ভাগবত পুরাণম্'।
১০। রূপ গোস্বামী, 'পদ্যাবলী' ইসকন, মায়াপুর।
১১। রমাকান্ত চক্রবর্তী- মধ্যযুগের বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম এবং তার প্রভাব (প্রবন্ধ) মধ্যযুগের বাংলায় সমাজ ও সংস্কৃতি, সম্পাদনাঃ অনিরুদ্ধ রায়, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা- ১৯৯২
১২। ই,সি, ডিমক, হিন্দুইজম এ্যানবড ইসলাম ইন মিডিয়াভ্যাল বেঙ্গল।
১৩। রবীন্দ্রনাথ মাইতি সম্পাদিত, অদ্বৈতমঙ্গল- হরিচরণ দাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩।
সীতাদেবীর জীবনী- সীতাগুণকদম্ব।
১৪। নৃপেন্দ্রলাল দাশ, আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের উদগাতা নিত্যানন্দ, মাসিক সমাজ দর্পণ, ঢাকা।
১৫। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, শ্রী খণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, বর্ধমান- ১৯৫৪
১৬। মণীন্দ্রনাথ গুহ- সম্পাদিত প্রবোধানন্দ সরস্বতী- শ্রীচৈত্যচন্দ্রামৃতম, পানিহাটি- ১৯৭০
১৭। হরিদাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনামস্তোত্র/১৯২২, কলকাতা- ১৯৭০
১৮। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত- হরিভক্তি বিলাস, বহরমপুর- ১৮৯৪
১৯। স্টুয়ার্ট মার্ক এল্কম্যান জীব গোস্বামী ও তত্ত্বসন্দর্ভ, দিল্লি- ১৯৮৬
২০। লোকনাথ দাস ও অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি সম্পাদিত- সীতা চরিত্র, হুগলী- ১৯২৬
২১। যদুনাথ সরকার, এ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, পাটনা- ১৯৭৭
২২। কে, এম পানিক্কর, এ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কলকাতা- ১৯৫৪
২৩। এস,কে,দে আর্লি-হিস্ট্রি অফ দ্যা বৈষ্ণব ফেথ এ্যান্ড মুভমেন্ট এন ইন্ডিয়া, কলকাতা- ১৯৬১, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি- ১৯৬১
২৪। কে. এল. দত্ত দ্য বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম এ্যান্ড মডার্ণ লাইফ, কলকাতা- ১৯৬১
২৫। বিপিন চন্দ্র পাল, বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম্ কলকাতা- ১৯৩৩

লেখক : প্রফেসর, লেখক, গবেষক ও বাগ্মী

হরিনাম সংকীর্তন

মনোজবিকাশ দেবরায়

যাঁর পদাশ্রয় শক্তি বলে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকরসমূহ থেকে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ (০১.০৩.০১)

এবার প্রবেশ করতে চাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে। আজকের পয়ার–

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামসঙ্কীর্ত্তন সার ॥
(আদি ০৩.৫০)

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত। এই ভাগবতের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থে দ্বাদশ স্কন্ধ এবং ১৮০০০ শ্লোক আছে। মদীয় ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন, 'ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত। অনাসক্তি, শুদ্ধাভক্তি ভাব সুনির্মল রে'॥ শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছেন ভক্তিশাস্ত্র।

ভক্তিযোগ আশ্রয় ইচ্ছুক ভক্তগণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা এবং এই গ্রন্থের তত্ত্ব অন্তরে অনুভব করা একান্ত কর্তব্য। কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এসে জগৎজীবকে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে–

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত - ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥
(০১.০১.৯৯)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীনিতাইসুন্দর দুই ভাই। তাঁরা দু'জন এসে শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তাঁদের শুভাবতরণের পূর্বে আমরা গ্রন্থ ভাগবতের সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছেন শ্রীভগবানের বাঙ্ময়ি রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বলতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজীকে বলছেন, 'কলিযুগে যারা নিজ ঘরে প্রতিদিন ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করে তাঁরা আনন্দিত চিত্তে ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। তাঁদের উপর আমি সদা প্রসন্ন থাকতে পারি। যার ঘরে ভাগবতের একটি শ্লোক, অর্ধেক শ্লোক অথবা শ্লোকের একটি পদ লেখা থাকে, তার ঘরে আমি বাস করি। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে দর্শন করে ও দাঁড়িয়ে প্রণাম করে, তাঁকে আমি ধন, স্ত্রী, পুত্র আর আমার ভক্তি প্রদান করি। হে চতুর্মুখ! যেখানে যেখানে ভাগবত কথা পাঠ হয় বৎস্যপ্রিয়া গাভীর মত আমি সেখানে গমন করি। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ আয়ু, আরোগ্য ও পুষ্টিদাতা। এই শাস্ত্র পাঠ শ্রবণে মানুষ সকল কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন'। বৈষ্ণবাচার্য ড. মহানামব্রতজী বলছেন, 'বাহিরের পরিচয়ের নাম দেখা। অন্তরের গভীর পরিচয়ের নাম সাক্ষাৎকার। মহাপ্রভু ভাগবতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় পরিচয় করাইয়াছেন। এই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের ফলে আমরা রক্ষা পাইয়াছি মহতী বিনষ্টি হইতে।'

'এক মহাবিনষ্টির যুগে, জাতীয় জীবনের এক ভীষণ দুর্দিনে এই জাতিকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন মহাপ্রভু। জাতীয় জীবনের মহা দুর্যোগে এ জাতি নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচিয়াছিল শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মহা করুণায় ভাগবতের মধ্যস্থতায়।

পূর্ব পূর্ব অবতারে শ্রীভগবান অস্ত্র ধারণ করে আসুরিক শক্তির বিনাশ সাধন করতঃ ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কিন্তু অস্ত্র ধারণ করেন নাই। কাহাকেও আঘাত করেন নাই।' (শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম খণ্ড, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী-ভূমিকা পৃ. ০২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের প্রেম বিতরণ করেছেন নাম সংকীর্তনের মধ্যে এবং ইহার দ্বারাই জগতের মঙ্গল সাধন নিশ্চিত করেছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর জীবের হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত করে অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা আমাদেরে জানালেন দুই ভাগবতের কথা। এক ভাগবত হচ্ছেন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র আর ভাগবত হলেন ভক্তিরস পাত্র ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা কথা বিস্তৃত কলেবরে বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রকে বড় ভাগবত বলা হয়। প্রেমভক্তিকেই যিনি পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন এইরূপ ভক্তিরস রসিক ভক্তই ভাগবত পদবাচ্য। এইরূপ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। এই দুই ভাগবতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ফল কী হলো? এর উত্তর আমরা পাব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে–

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥
(আদি.০১.১০০)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা এবং ভক্তিরস পাত্র ভক্তের সঙ্গ করিয়ে হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীভগবানকে প্রেমের দ্বারা বশীভূত করালেন। শ্রীভগবান নিজেই ভক্ত প্রেমবশ্যতার কথা স্বীকার করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দুর্ব্বাসা মুনিকে শ্রীভগবান বলেছেন,

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র বৈ দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
(ভা.০৯.০৫.৬৩)

শ্লোকার্থ : হে দুর্ব্বাসা! আমি সম্পূর্ণরূপে ভক্তের অধীন। তাই আমি স্বাধীন নই। সহজ-সরল ভক্তজন আমার হৃদয় অধিকার করে রেখেছে। ভক্তগণ আমার প্রিয় এবং আমি তাদের শ্রেয় ॥

হে দুর্বাসা! আমি তাঁদের কথা কি বলব, আমি তাঁদের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া কিছু জানে না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানি না। (ভা.০৯.০৫.৬৮)

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন হলো। এবার শ্রীমদ্ভাগবত আমাদেরে কি আজ্ঞা দিচ্ছেন তা জানার চেষ্টা করবো। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদেরে বার বার বলছেন হে কলিহত জীব! শ্রবণ করো এক গুহ্যতম সংবাদ। কলিযুগে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনই সারবস্তু। এখন শ্রীমদ্ভাগবতে এই গুহ্যতম সংবাদটি কোথায় আছে তা খুঁজতে চেষ্টা করবো।

শ্রীনারদ বাক্য–

যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
তৎ ফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্তনাৎ ॥
(মাহাত্ম্য.০১.৬৮)

শ্লোকার্থ : যোগসাধন, তপস্যা বা সমাধি দ্বারা যে ফল লাভ করা যায় না, কলিযুগে সেই ফল অতি উত্তমরূপে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামকীর্তনের দ্বারাই লাভ করা যায়।

শ্রীশুক বাক্য–

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥
(ভা.০২.০১.১১)

শ্লোকার্থ : ঐহিক বা পারত্রিক কোন ইচ্ছা থাকলে অথবা সংসারকে দুঃখরূপ মনে করে বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে যে নির্ভয় মোক্ষপ্রাপ্তি কামনা করে সেইরূপ সাধকদের অথবা যোগসিদ্ধজ্ঞানীদের পক্ষেও সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ হল ভগবন্নামসংকীর্তন ॥

শ্রীভগবান কপিলদেব বাক্য–

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎ প্রবণাদ্যৎস্মরণাদপি কৃচিৎ।
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবনু দর্শনাৎ।
(ভা.০৩.৩৩.০৬)

শ্লোকার্থ : হে ভগবান! তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে অথবা ভুলেও যদি কখনো তোমার বন্দনা বা স্মরণ করে তাহলে কুকুর মাংসভোজী চণ্ডালও সোমযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণের তুল্য পূজনীয় হতে পারে; সুতরাং তোমার দর্শন করলে যে মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায় এর আর বেশী কথা কী!

শ্রীবিষ্ণুদূত বাক্য–

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিত্যিবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাময় ॥
(ভা.০৬.০২.১৫)

শ্লোকার্থ : যে ব্যক্তি উচ্চস্থান থেকে পতনের সময়, পথ চলতে চলতে পদস্খলনের সময়, ভগ্নদেহ অবস্থায় অথবা সর্পাদি কর্তৃক দশংনকালে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বা আহত হয়ে বিবশ অবস্থায় হরি হরি বলে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিকে আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

এমনি অসংখ্য শ্লোকে হরিনামের জয়গান করা হয়েছে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি হরিনাম সংকীর্তনমূলক পদের চার লাইন উদ্ধৃত করেই প্রবন্ধের বিশ্রাম টানছি–

হরি হরি বলে, দু'নয়ন জলে,
ভাসিবে উরস মোর।
বলে শ্রীগৌরাঙ্গ, হব অবশাঙ্গ,
যুগল প্রেমেতে ভোর।
(সংকীর্তন পদামৃত পৃ. ১২৪)

কলিযুগে হরিনাম শ্রেষ্ঠ সাধন। নাম শ্রদ্ধার সহিত করা হলে স্বয়ং নামী সংকীর্তন আসরে নেমে আসেন। প্রেম নয়ন উন্মীলিত হয় ভাগ্যবান ভক্তগণ ভগবানকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে থাকেন। হরিনাম সংকীর্তনকে ভুবনমঙ্গল যজ্ঞ বলা হয়। হরিনাম সংকীর্তনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধিত হয়। তাই অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নানাস্থানে হরিনাম সংকীর্তন করার জন্য বলা হয়েছে। হরিনাম করে মৃত্যু হলে মানুষের আর হয় না বলে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন। হরিনাম সংকীর্তনের জয় হোক।

জয় জগদ্বন্ধু হরি।

লেখক : ধর্মবেত্তা ও লেখক। চেয়ারম্যান, ট্রাস্টি বোর্ড, শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম।

বাঙালি সংস্কৃতি : পুরাতনের অনুবর্তন

ড. রতন সিদ্দিকী

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে মত ও মতামতের অভাব নেই। সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক বাংলায় সংস্কৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো ইয়ং বেঙ্গলদের দাপটের সময়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যে আলোড়ন তুলেছিল বাঙালি স্বরাজে সেই অভিঘাতের অভিজ্ঞানে সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতি বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠেছিল। তাই তাঁরা তাঁদের মতো করে আলোচনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেসব আলোচনাকে সংহত করে নিজের মতামত প্রদান করলেন। তাই সংস্কৃতি বিষয়ে বাঙালির স্বীকৃত মত হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। আবার ঐ মতকে ভিত্তি ধরে মতামত দিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ। তাদের মতকে পুনশ্চ সংহত করে যারা ব্যাখ্যা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আহমদ শরীফ তাঁর সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সংহত মতটি হলো–

> জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠীগতও। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে একারণেই। বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন জীবিকার নিরাপদ নিরুপদ্রব লক্ষণ-লালন লক্ষ্যেই মানুষের মানস সংস্কৃতি ও তজ্জাত ব্যবহারিক উপকরণ এবং বৈষয়িক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুভূতিও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষাও প্রয়োজন-চেতনার বহিঃরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন-নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য-দুর্দশনর উপর নির্ভরশীল। যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকারের অনুকূল পরিবেশ, সেখানে সংস্কৃতি জীবনের সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক বিকাশের এবং জীবিকার স্বচ্ছন্দ প্রসারের লাবণ্যে বর্ধিষ্ণু, যেখানে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জড়তায়, জীর্ণতায় ও চিরন্তনতায় বিকৃত, প্রথাগত নিষ্প্রাণ আচার ও আচরণমাত্র। কারণ বেঁচে বর্তে থাকার পদ্ধতিই জন্ম দিয়েছে শাস্ত্রের, সমাজের, সাংস্কৃতির, সভ্যতার ও রাষ্ট্রের। সেই বাঁচার প্রয়াস যখন কোন বিরুদ্ধ বিরূপ শক্তি রোধ করে দাঁড়ায়, তখন জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-প্রয়াস ও আচরণ আবর্তনধর্মী হয়েই জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। (আহমদ শরীফ; বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ২০০৮ পৃ.১১)

আহমদ শরীফের মতামতটি যথার্থ। বাঙালি সংস্কৃতি বরাবরই বিরুদ্ধে ও বৈরিতায় পুরাতনের অনুবর্তন করেই বিকশিত ও রূপান্তরিত হয়ে আজকের স্তরে এসে পৌছেছে। ইতিহাসের আলোকে বক্তব্যটির যথার্থতা নিরুপণের পূর্বে প্রত্নবাংলার দিকে লক্ষ্য করা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে প্রত্নবাংলা পুন্ড্র, বঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি জনপদ প্রথমে কৌম সমাজে এবং পরে গোত্রীয় সমাজে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যা প্রাচীন ঐতরেয় আরণ্যক ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলির ভাষ্যে পাওয়া যায়। তারা যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করে এদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আর্যরা। তখন আর্য বৈরিতায় স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্নবাংলার রক্ত সংকর বাঙালিরা সে সময় তাদের আপন সংস্কৃতির প্রধানত অনুবর্তন করেছে। পাশাপাশি আর্যদের সংস্কৃতিও অনেকাংশে গ্রহণ করে নিজ সংস্কৃতির রূপান্তরও করেছে। অনুমান করা যায় তথাকথিত পাণ্ডববর্জিত এই জনপদের মানুষদের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলার প্রবণতার যে কথা সর্বত্র বলা হয় তা আর্যদের দখলপূর্বের পরাজয়ের বেদনা লুকানোর প্রয়াস। তবে জৈন-বৌদ্ধ-শ্রাবক-শ্রমণ-ভিক্ষুর মাধ্যমে শাস্ত্রশাসিত আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে প্রত্ন বাংলায়। মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলেও ঐ একই ধারায় বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ সময় সংস্কৃতি বিকাশের বিরুদ্ধতা প্রবল হয়ে ওঠেনি। মাৎস্যন্যায় শতাব্দীতে তিব্বতী আক্রমণ, হিমালয় উপত্যকাবাসী শৈল বংশীয় রাজাদের আগ্রাসন, কার্যমীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যর অভিযান প্রভৃতির কারণে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ প্রায় অবরুদ্ধ থাকে। এ জনপদের মানুষরা যাদেরকে প্রত্নবাঙালি বলা যেতে পারে, তারা তাদের ভাবনা-চিন্তা-কর্ম ও আচরণকে পুরাতনের অনুবর্তন করে বাঁচিয়ে রাখে। তারা শাস্ত্রাবসিত ধর্ম ও আচারকে যেমন অনুসরণ করে তেমনি পুরাতন ভূত-ভগবান,

বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-উচ্চরণকে অস্বীকার করে না। ফলে ধর্মীয় সংস্কৃতি বিজয়ী শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি ও প্রচলিত সংস্কৃতি মিলে একটি নবধারার রূপান্তরিত সংস্কৃতির সৃষ্টি হলো, যা পাল শাসনামলে স্থির হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির অবয়ব পেলো। যা সেন শাসনামলের পূর্বে- রূপময় হয়ে উঠলো। যাকে বাঙালি সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা গেলো। চর্যাপদের কবি ভুসুকু পা সেই সমকারের সত্যকে উচ্চারণ করে নিজেকে বাঙালি বলে দাবি করলেন।

বাংলার বহিরাগত সেনরা বাঙালি সংস্কৃতিকে বিষিতবিরুধে বিষাদময়, করে তুলেছিল। তারা রক্ষণশীল ও কঠোররীতিবদ্ধ হিন্দুত্ব বাঙালি সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দেয়। তাদের পারবশ্যতায় বাঙালিসংস্কৃতির বিকাশ প্রবলভাবে ব্যহত হয়। সেনদের হটিয়ে যখন তুর্কি হাত ধরে বাংলায় সাড়ে পাঁচশত বছরের সুমলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যময় বিকাশ ঘটেনি। পুরাতনের অনুবর্তন করেই বাঙালি সংস্কৃতি অস্থিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তবে এসময়কালে সুলতানি আমলে, আকবরি শাসনে শ্রীচৈতন্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে শাহ সুজার সুবাদারিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সন্তোষজনকভাবেই হয়। তবে এসময়কাল অবধি অর্থাৎ মৌর্য যুগ থেকে সিরাজুদৌলার সময়কাল পর্যন্ত চলেছে জৈন্য, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সংস্কৃতিদ্বারা বিকাশমান বাঙালি সংস্কৃতির ভ্রমাত্মক রূপান্তর। যার কারণে বাঙালি সংস্কৃতি তার প্রারম্ভিক অনুষ্ণতা বা স্নিগ্ধতা অনেকখানি হারিয়ে ফেলে। সিরাজুদৌলার পরাজয়ের পর বাংলার ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদের উল্লেখ হয় সেই জাতীয়তাবাদই বাঙালি সংস্কৃতিতে সজীব করে তোলে। পূর্বে ব্যক্ত ইয়ং বেঙ্গলদের বিপরীতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পূর্বোক্ত বাঙালি মনীষীরা বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের স্বার্থে পুরাতনের অনুবর্তনে সোচ্চার ও সক্রিয় হন। তারা সংরক্ষণেও উদ্যোগী হন। তাদের প্রযত্ন প্রচেষ্টায় বাঙালি সংস্কৃতি ভ্রান্তি, চ্যুতি ও স্খলন থেকে মুক্তির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং অনেকাংশেই সফল হয়। বাঙালি সংস্কৃতির এ লড়াই ইংরেজ শাসনামলে বার বার তীব্র হয়ে উঠেছে। হিন্দু কলেজের সময়কালে, সিপাহী বিদ্রোহের উত্তরসময়ে, বঙ্গভঙ্গের দুর্যোগক্ষণে লড়াইটি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতি ব্যাপক পরাজয় হয় জিন্নার ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের সাময়িক বিজয়ের সময়ে অর্থাৎ ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতার কারণে বাংলা ভাগের সময়। বাঙালি সংস্কৃতি তখন পূর্ব বাংলায় নিদারুণভাবে পরাস্থ হয়ে গভীর সংকটাপন্ন হয়। মহান ভাষাআন্দোলন সেখান থেকে উদ্ধার করে বাঙালি ও তার সংস্কৃতিকে। সেই বাঙালির জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের শুরু। এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথধরে আসে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। এ সময়কালে বাঙালি সময়ের অভিজ্ঞাত অভিজ্ঞান ও আলোড়ন থেকে বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির ইতিবাচক উপাদান গ্রহণ করে আপন বাঙালি সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি পুরাজনের অনুবর্তনকে যেমন বক্ষলগ্ন করেছে তেমনি সময় ও সমাজের দাবিকে অগ্রাহ্য করেনি। আর এর মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতির যে রূপ দাঁড়াল তা প্রকৃত অর্থেই বাঙালি সংস্কৃতির বিকশিত ও রূপান্তরিত রূপ। প্রকৃত বাঙালিরা তাকেই গ্রহণ করলো অকপটে। এই অন্বিত বাঙালিসংস্কৃতিই সুস্পষ্ঠভাবে নির্ণিত বাঙালি সংস্কৃতি।

সেবিবেচনায় বাঙালি সংস্কৃতি কর্মকণ্ঠময়। জৈন, বৌদ্ধ, সন্ন্যাস-বৈষ্ণব সে কর্মকুণ্ঠতাকে তীব্র করেছে। তাই কর্মকুণ্ঠ বাঙালি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দেবানুগ্রাহী। তারা শ্রম ও প্রজ্ঞা অপেক্ষা নিয়তিও সংস্কারমুখী। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুক, মাদুলি-তাবিজ, ডাকিন-যোগিনী, তন্ত্র-মন্ত্রে তাদের বিশ্বাস প্রবল। বৈরাগ্যে আগ্রহ ও আধ্যাত্মিকতায় আস্থা তাদের কমৃকুণ্ঠতাপ্রসূত। প্রকৃতিনির্ভর কৃষি, আবহাওয়া, খাল, নদীর আধিক্য এবং খাদ্যাভাস বাঙালিকে যেমন আলস্যপূর্ণ জীবন দিয়েছে তেমনি তাদের গান-কবিতা, নাট-নাট্যপ্রিয়তাও দিয়েছে। আহমদ শরীফের পূর্বোক্ত উক্তি-জীবিকাসম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি এখানে যথার্থ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ বিদেশি-বিজাতীয়দের দ্বারা বিজিত বাংলা শাসকশ্রেণির বৈরিতায় এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতায় বার বার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বলে তার সংস্কৃতির বিকাশ বিঘ্ন হয়েছে। তাকে পুরাতনের অনুবর্তন করতে হয়েছে। তবে পুরাতনের উপাদান সাম্প্রদায়ি ও শ্রেণিগত সৌষম্য শাসকগোষ্ঠীর নগ্নতায় ক্লিন্ন হয়েছে।

বাঙালিসংস্কৃতির এই পুরাতনের অনুবর্তন ও রূপান্তর সম্পর্কে অসাধারণ স্বীকৃতি দিয়েছেন ড. নীহাররঞ্জন রায় তার ‘বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, বাংলায় যখন যে আদর্শ ভাব-স্রোত, আলোড়ন, ঘটনার তরঙ্গ এসে পড়েছে, বাংলা তখন বেতস লতার মতো নুয়ে পড়ে অনিবার্য বোধে তাকে মেনে নিয়েছে। আবার ক্রমান্বয়ে নিজের মতো করে তাকে গড়ে নিয়ে নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করে নিয়ে পুনরায় বেতস লতার মতোই সোজা হয়ে স্বরূপে দাঁড়িয়েছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালিকে বার বার বাঁচিয়েছে।

তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় বাঙালি যেমন বার বার বেঁচেছে বাঙালি সংস্কৃতিও তেমনি বার বার লড়াইকরে বেঁচে আছে আর তাত্ত্বিকসত্য হলো পুরাতনের অনুবর্তন ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ হয় না। সংস্কৃতি বাঁচে না। দুর্দমনীয় বাঙালি সংস্কৃতি বেতস গাছের মতো প্রাণশক্তি নিয়ে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে।

লেখক : প্রফেসর ও গবেষক

সনাতনধর্ম ও এর মৌলিকত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা

ডা. সত্যকাম চক্রবর্ত্তী

ধর্ম হিসেবে সনাতন ধর্ম পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ধর্ম। এই ধর্মের মূল ভিত্তি চারটি বেদ। সংস্কৃতে সনাতন শব্দের অর্থ 'চিরন্তন ধর্ম'। শাশ্বত বৈদিক উৎসের এই প্রাচীনতম ধর্মের উৎপত্তি ও এর বহমান ধারার মূল উপাদান এর সর্বজনীনতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। এটি একটি চিরন্তন পন্থা। যা বর্ণ, গোত্র ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত এবং পথকে একত্রিত করেছে।

মূল ধর্মটির মৌল ভিত্তি বেদ, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর ব্যাখ্যা এবং চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা একাধিক ভাবধারার জন্ম দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে সনাতন ধর্ম, আংশিক রূপান্তরিত হয়ে কালান্তরে এটি, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মই সনাতন ভাবধারার ধর্মাচারে রূপান্তরিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের একটি পবিত্র জীবনধারা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বৈদিক যুগে হিন্দুধর্মের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মূলত সিন্ধুপাড়ের একটি বৃহত্তর অভিজাত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক ধর্ম ও জীবনচর্চাকে কোন এক আধিকারিক সম্প্রদায় হিন্দু নামে অভিহিত করেছিল এবং সেটাই পৃথিবীব্যাপী পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম' নামে অবহিত হয়ে চর্চিত হয়ে আসছে। এই ধর্মের মৌল ভিত্তি বেদ হওয়ায় কোন কোন সময় 'বৈদিক ধর্ম' নামেও একে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু ধর্মাচারণের মধ্যে এর একটি আলাদা সৌন্দর্য বিদ্যমান। এখানে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিভিন্ন কলা ও সংস্কৃতির চর্চা, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, অহিংসা সর্বোপরি পার্থিব জগতের জনকল্যাণের মতো কর্মকাণ্ডই এর মূল সৌন্দর্য। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এই ধর্মে শুদ্ধ মানবিক চর্চা, যুগে যুগে বিদ্যমান থাকায় এই জ্ঞানভিত্তিক ধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করেছে। আর এই জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা সর্বোতভাবে একে করেছে সৌন্দর্যমণ্ডিত। আরও উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের সাথে জনকল্যাণমূলক সেবা, ব্যবস্থাপনা এই ধর্মে সকল জনগোষ্ঠীকে সফলভাবে সম্পৃক্ত করেছে।

মূলধর্মগ্রন্থ চতুর্বেদের পরেই বিগত তিন যুগে বিভিন্ন গ্রন্থ ও উপাখ্যান রচিত হয়েছে এবং এই মহাকাব্যিক রচনা গুলি মূলত উপস্থাপিত ঘটনাক্রমকে আমাদের গোচরে এনে ধর্মের মূল ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে। যেমন ত্রেতা যুগে 'রামায়ণ' আমাদেরকে দিয়েছে ত্যাগের শিক্ষা, দ্বাপরযুগে 'মহাভারত' শিক্ষা দিয়েছে অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের শিক্ষা এবং এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদেরকে দেখিয়েছে পার্থিব জগতের সকল সমস্যা সমাধানের পথ। গীতা কেবল মাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ বললে পুরোটা বলা হবে না, এটি একটি পূর্ণ জীবন দর্শন (Complete Philosophy of Life)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত সমস্যার সঠিক সমাধান বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে। একমাত্র গীতা অনুশীলনেই আমরা ভগবান নির্দেশিত পথে চলার এবং পার্থিব জগতে সকল সমস্যা সমাধানের পথ খুজে পেতে পারি। গীতা ভগবান মুখঃনিঃসৃত অমৃত বাণী। এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্নিবেশিত আছে। তবে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শুধু পাঠ করলে হবে না, এটাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং অন্যকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে গীতাকে উপলব্ধ করাতে হবে। মনে রাখতে হবে "Knowledge is not power, execution of knowledge is power". বলা যেতে পারে গীতা পড়লেই হবে না, এর নির্দেশিত পথে নিজেকে পরিচালিত করলেই আমরা মানবজাতি সঠিক পথে, ধর্মাচরণের মাধ্যমে, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো।

গীতায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য আছে, যুগে যুগে সত্যকে রক্ষা করার জন্য ভগবান আবির্ভুত হবেন এবং দুষ্টের দমন করে সৃষ্টিকে রক্ষা করবেন। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবী, রাষ্ট্র, সমাজ সর্বপোরি ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে ভগবান অবতাররূপে বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই অবতারগণ তাদের উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন শেষে এই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কলিযুগের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এটা আমরা সকলেই জানি বা মানি। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে আবির্ভুত হয়েছিলেন এবং ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিরোধান করেন। তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীমতী

শচী দেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবদ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযুগ প্রচারের প্রবক্তা। তিনি ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য ও ভগবত প্রেমের উদারতা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভারতের নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ধাম মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ব্যবহৃত পদযুগল প্রতিষ্ঠিত আছে। এ নিয়ে একটি কাহিনিও কথিত রয়েছে। সন্ন্যাস নেওয়ার এক বছরের মাথায় তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাথে দেখা করে ফিরে যাওয়ার সময় এই পাদুকাটি ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এর পর থেকেই এই কাষ্ঠ নির্মিত, ব্যবহৃত পবিত্র পাদুকা, মহাপ্রভুর সংরক্ষিত নিদর্শন হয়ে পূজিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গত এই পাদুকা পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ থেকে ভক্তজনের দর্শন ও পূজনের জন্য শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সবশেষে এই কথাটি উল্লেখ করতে চাই। সনাতনধর্মের মৌলিক উপাদানের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, সেবা, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, সর্বোপরি সকল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কল্যাণকর কর্ম প্রক্রিয়া সম্পৃক্ত রয়েছে। তাই সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠানে যদি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতভিত্তিক জ্ঞান, সংস্কৃতি ও শুদ্ধাচারের চর্চা বজায় রাখা যায় তাহলেই এই ধর্মকে সর্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে। ধর্ম টিকে থাকবে মানব কল্যাণের পাথেয় হয়ে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। প্রেসিডিয়াম সদস্য : বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, শ্রীমঙ্গল।

স্বামী শিবানন্দবাবার হস্তলিখিত আশীর্বাণী

Chaitanya Mahaprabu
is the latest incarnation
of God. His divine
Theory - Inconceivable
Simutaneous distinction
& non-distinction theory
promulgated by Sri Krisna
Chaitanya Mahaprabu.
অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব
I visited Sridham Jaipur
with my full satisfaction.
My birth place - Bahubal
Village - Haritala
District - Habiganj
Bangadesh.
Swami Sivananda
স্বামী শিবানন্দ
২৫/২২ কবীর মঠ
বারাণসী--২২১০০৫

M 800 58 60 960

১২৭ বছরের যোগী পুরুষ ঢাকায়

চাহিদামুক্ত জীবনের উপদেশ স্বামী শিবানন্দের

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ইকবাল রোডের ওই বাড়ির চারতলার ‘ফোর ডি’ ইউনিটে ঢুকেই দেখা গেল, ছোটখাটো গড়নের এক যোগী পুরুষ মেঝের ওপরে পাতা বিছানায় বজ্রাসনে বসে আছেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। পরনে সাদা রঙের সাধারণ কুর্তা এবং ধুতি, পা নিরাবরণ। আটপৌরে এই বেশেই তিনি থাকেন সবসময়। এমন সাধারণ বেশেই তিনি পদ্মশ্রী সম্মানও নিয়েছেন। গতকালও ঢাকার ওই বাড়িতে দেখা গেল, জীবনযাপন সম্পর্কে নানা উপদেশ দিচ্ছেন। সামনে বসে জনা সাতেক মানুষ সেইসব কথা শুনে নিজেই নিজের জীবনের হিসাব মেলাচ্ছেন।

এই যোগী পুরুষ হলেন স্বামী শিবানন্দ। তার বয়স ১২৭ বছর ৬ মাস। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বয়সের এই পুরুষ ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারণসীর (কাশী) কবীরনগরে একটি আশ্রমে থাকেন। স্বামী শিবানন্দ যোগব্যায়ামে অবদানের জন্য ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা আসেন। সর্বশেষ ঢাকায় এসেছিলেন ২০১৯ সালে।

জীবনের শতবর্ষকে আরো সিকি শতক পিছনে ফেলে আসা সেই মানুষটি ঢাকায় এসে গতকাল ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালেন তার দীর্ঘজীবনের রহস্যের কথা। বললেন, চাহিদামুক্ত জীবনই হলো রোগমুক্ত জীবনের চাবিকাঠি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ৩৯ বছর পর তার জন্ম। দেখেছেন ব্রিটিশশাসিত ভারতের রূপ। প্রত্যক্ষ করেছেন নানা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস। সাক্ষী থেকেছেন অনেক কিছুর, এখনো তিনি দেখে চলেছেন, যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। সহজিয়া সাধনার এই কথাখানি বয়স ও অভিজ্ঞতার নিরিখে যেন অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বামী শিবানন্দ।

তার জন্ম ১৮৯৬ সালে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলের হরিপুর গ্রামে। দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন যোগাভ্যাস চর্চায়। আজো প্রতিদিন রাত ৩টার সময় তার ঘুম ভাঙে। তারপর সারাদিন কাটে নিরলস পরিশ্রমে। মাত্র ৬ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারান তিনি। দিনের পর দিন আহার বলতে ছিল শুধু ভাতের ফ্যান। তারপর এক সময় আশ্রয় পান ১৯০৩ সালে নবদ্বীপে ওঙ্কারানন্দ গোস্বামীর আশ্রমে। সেখান থেকেই শুরু হয় তার জীবনের নতুন অধ্যায়। নবজন্ম লাভের পর আর পা রাখেননি পুরনো পথে। সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী এই যোগীর আহার বলতে তেলহীন সামান্য খাবার। পিছিয়ে থাকা অনগ্রসরদের সাহায্য করা, তাদের পাশে দাঁড়ানোই তার জীবনের ব্রত। একাধিকবার তিনি বলেছেন তার সুস্থ দীর্ঘ জীবনের রহস্য হলো যোগাভ্যাস, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং ব্রহ্মচর্য। তারুণ্যেই ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি। তার কথায়, এই বিশ্বই আমার ঘর। বিশ্ববাসী আমার বাবা মা। তাদের ভালবাসা এবং সেবা করাই আমার জীবনের পরম ধর্ম। গত অর্ধশতক ধরে পুরীতে তিনি সেবা করছেন কুষ্ঠরোগীদের। একাধিক সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। পদ্মশ্রী পাওয়ার আগে তিনি ২০১৯ সালে পেয়েছিলেন ‘যোগরত্ন সম্মান’।

তিনি জন্মসূত্রে ভিখারির সন্তান ও আকুমার ব্রহ্মচারী। মাত্র ৬ মাস বয়সে একইদিনে বাবা ও মাকে হারান। এরপর থেকে মানুষের মাধ্যমে তিনি বড় হন। দীর্ঘ ১২৭ বছরের জীবনে তিনি কারো কাছ থেকে কোনো অর্থ কিংবা দান নেন নি। কেন দান নেন না– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ ভিখারি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে সবাই ভিখারি। প্রত্যেকেই কারো না কারো কাছ থেকে চেয়ে নেন। কেউ সরাসরি চেয়ে নেন, কেউ ঘুরপথে নেন। যেখানে সবাই ভিখারি সেখানে আমি ভিখারিকে কে দেবে? এজন্য আমি কারো কাছ থেকে কিছু নেইনি।

দীর্ঘ ১২৭ বছরের জীবন কীভাবে উপভোগ করলেন, নিরোগ থাকার উপায় কী- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খাদ্যাভ্যাস একটি বড় বিষয়। দুবেলা ভাত খেলেও তাতে সিদ্ধ কিংবা ডাল কিংবা সবজিই থাকে। এর বাইরে কিছুই খান না।

এমনকি দুধ কিংবা ফলও খান না। তার মতে, মানুষ মনে করে ফল কিংবা দুধ খেলেই শরীরের জন্য ভালো। কিন্তু আমি ফল ও দুধ ছাড়াই দীর্ঘজীবন কাটাচ্ছি। তিনি রাত ৯টায় শুয়ে পড়েন। ভোররাত ৩টায় জেগে শুরু করেন নানা ধরনের যোগব্যায়াম। ভোর ৬টার দিকে যোগ্যব্যায়াম, প্রাণায়াম শেষ করে হালকা খাবার নেন। হালকা খাবারের মধ্যে রয়েছে বার্লি, মুড়ি ও লাল ছোলা। এরপরে দিনভর নানা কাজ।

এভাবেই জীবন চলবে এমন উপলব্ধি কবে হলো- এমন প্রশ্নের জবাবে তার উত্তর বাব-মা হারানোর পর থেকেই মনে হয়েছে আমি ভিখারি। আমাকে ভিখারির মতোই চলতে হবে। এজন্য খাবারের চেয়ে জ্ঞান আহরণে বেশি সময় দেয়া শুরু করলাম। বিদ্বান সব জায়গায় পূজিত। টাকা পয়সার মালিকরা শুধু নিজের জায়গায় পূজিত। কিন্তু এখন তো সবাই টাকা পয়সাওয়ালা মানুষের দিকেই ছুটে-এমন প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে হেসে বললেন, ছুটতেই পারে। ওরা কি বেশি দূর যেতে পারে? অপরদিকে বিদ্বান ব্যক্তি সব জায়গায় যাচ্ছে। আখেরে তাদেরই জয়জয়কার। সবমিলিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বশ্যতা থাকলেই টাকা ছাড়া চলা সম্ভব। এতে সমাজে অস্থিরতা বাড়ে না। জীবনে সুখে থাকা কিংবা নিরোগ থাকার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বশ্যতা। কমপ্লিট সারেন্ডার।

পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার খবর শুনে কী মনে হয়েছিল- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাশীতে ওই আশ্রমে বসে আছি। বিকালে বহু পুলিশ ও আধিকারিক (কর্মকর্তা) হাজির। তারা আমার নাম ঠিকানা লিখল। তারপরে জানলাম আমাকে ভারত সম্মানিত করেছে। এই সম্মানও মানুষের দান। পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার পর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বামী শিবানন্দকে চিঠি দেন। সেই চিঠি গতকাল ভোরের কাগজকে দেখালেন। তাতে লেখা ছিল- ভারতের রাষ্ট্রপতি আপনার লোকপ্রেরক জীবন এবং নতুন প্রজন্মকে দিকদর্শনের মধ্য দিয়ে আপনার উল্লেখযোগ্য অবদান আপনাকে 'যোগ' এর জন্য 'পদ্মশ্রী' সম্মানে সম্মানিত করেছেন। আপনি যোগধ্যান এবং সেবার মধ্য দিয়ে সংসারের জন্য এক প্রেরণা উপস্থাপিত করেছেন। এই খুশির আবহের মধ্যে ২০১৯ এর বাংলাদেশ এবং ২০২৪ এর বাংলাদেশের পার্থক্য জানতে চাইলে তার উত্তর, এই ৫ বছরে বাংলাদেশের বহু পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সবকিছুতেই পরিবর্তন। তিনি বললেন, ভালো থাকুক বাংলাদেশ, এখানকার মানুষজন নিরোগ থাকুক। সবার জীবন সুন্দর হোক।

১২৭ বছরের যোগী পুরুষ ঢাকায়

চাহিদামুক্ত জীবনের উপদেশ স্বামী শিবানন্দের

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য : রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ইকবাল রোডের ওই বাড়ির চারতলার 'ফোর ডি' ইউনিটে ঢুকেই দেখা গেল, ছোটখাটো গড়নের এক যোগী পুরুষ মেঝের ওপরে পাতা বিছানায় বজ্রাসনে বসে আছেন। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ। পরনে সাদা রঙের সাধারণ কুর্তা এবং ধুতি, পা নিরাবরণ। আটপৌরে এই বেশেই তিনি থাকেন সবসময়। এমন সাধারণ বেশেই তিনি পদ্মশ্রী সম্মানও নিয়েছেন। গতকালও ঢাকার ওই বাড়িতে দেখা গেল, জীবনযাপন সম্পর্কে নানা উপদেশ দিচ্ছেন। সামনে বসে জনা সাতেক মানুষ সেইসব কথা শুনে নিজেই নিজের জীবনের হিসাব মেলাচ্ছেন।

এই যোগী পুরুষ হলেন স্বামী শিবানন্দ। তার বয়স ১২৭ বছর ৬ মাস। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বয়সের এই পুরুষ ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারণসীর (কাশী) কবীরনগরে একটি আশ্রমে থাকেন। স্বামী শিবানন্দ যোগব্যায়ামে অবদানের জন্য ২০২২ সালের জানুয়ারিতে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা আসেন। সর্বশেষ ঢাকায় এসেছিলেন ২০১৯ সালে।

জীবনের শতবর্ষকে আরো সিকি শতক পিছনে ফেলে আসা সেই মানুষটি ঢাকায় এসে গতকাল ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানালেন তার দীর্ঘজীবনের রহস্যের কথা। বললেন, চাহিদামুক্ত জীবনই হলো রোগমুক্ত জীবনের চাবিকাঠি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ৩৯ বছর পর তার জন্ম। দেখেছেন ব্রিটিশশাসিত ভারতের রূপ। প্রত্যক্ষ করেছেন নানা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস। সাক্ষী থেকেছেন অনেক কিছুর, এখনো তিনি দেখে চলেছেন, যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। সহজিয়া সাধনার এই কথাখানি বয়স ও অভিজ্ঞতার নিরিখে যেন অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বামী শিবানন্দ ।

তার জন্ম ১৮৯৬ সালে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলের হরিপুর গ্রামে। দীর্ঘ জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন যোগাভ্যাস চর্চায়। আজো প্রতিদিন রাত ৩টার সময় তার ঘুম ভাঙে। তারপর সারাদিন কাটে নিরলস পরিশ্রমে। মাত্র ৬ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারান তিনি। দিনের পর দিন

এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

স্বামী শিবানন্দ

দৈনিক ভোরের কাগজে ছাপা হওয়া রিপোর্টের অংশবিশেষ

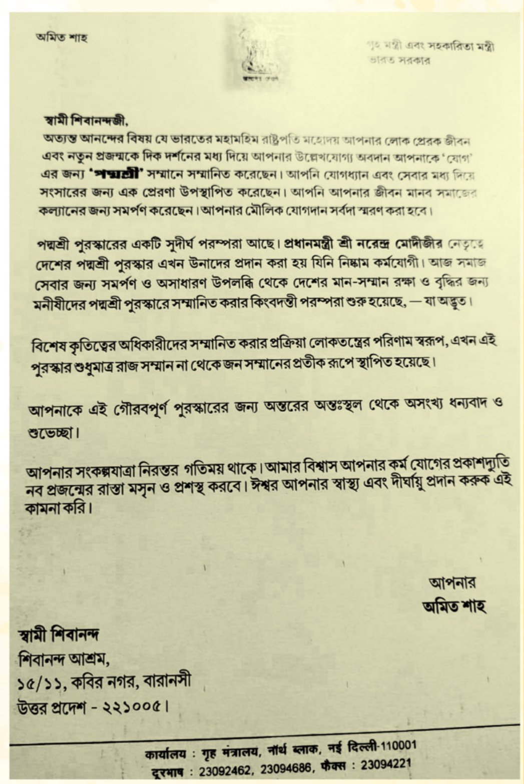

অমিত শাহ

গৃহ মন্ত্রী এবং সহকারিতা মন্ত্রী
ভারত সরকার

স্বামী শিবানন্দজী,
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি মহোদয় আপনার লোক প্রেরক জীবন এবং নতুন প্রজন্মকে দিক দর্শনের মধ্য দিয়ে আপনার উল্লেখযোগ্য অবদান আপনাকে 'যোগ' এর জন্য **'পদ্মশ্রী'** সম্মানে সম্মানিত করেছেন। আপনি যোগধ্যান এবং সেবার মধ্য দিয়ে সংসারের জন্য এক প্রেরণা উপস্থাপিত করেছেন। আপনি আপনার জীবন মানব সমাজের কল্যানের জন্য সমর্পণ করেছেন। আপনার মৌলিক যোগদান সর্বদা স্মরণ করা হবে।

পদ্মশ্রী পুরস্কারের একটি সুদীর্ঘ পরম্পরা আছে। **প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর** নেতৃত্বে দেশের পদ্মশ্রী পুরস্কার এখন উনাদের প্রদান করা হয় যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী। আজ সমাজ সেবার জন্য সমর্পণ ও অসাধারণ উপলব্ধি থেকে দেশের মান-সম্মান রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য মনীষীদের পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করার কিংবদন্তী পরম্পরা শুরু হয়েছে, — যা অদ্ভুত।

বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারীদের সম্মানিত করার প্রক্রিয়া লোকতন্ত্রের পরিণাম স্বরূপ, এখন এই পুরস্কার শুধুমাত্র রাজ সম্মান না থেকে জন সম্মানের প্রতীক রূপে স্থাপিত হয়েছে।

আপনাকে এই গৌরবপূর্ণ পুরস্কারের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

আপনার সংকল্পযাত্রা নিরন্তর গতিময় থাকে। আমার বিশ্বাস আপনার কর্ম যোগের প্রকাশদ্যুতি নব প্রজন্মের রাস্তা মসৃন ও প্রশস্থ করবে। ঈশ্বর আপনার স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু প্রদান করুক এই কামনা করি।

আপনার
অমিত শাহ

স্বামী শিবানন্দ
শিবানন্দ আশ্রম,
১৫/১১, কবির নগর, বারানসী
উত্তর প্রদেশ - ২২১০০৫।

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, **फैक्स** : 23094221

স্বামী শিবানন্দের উদ্দেশে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
অমিত শাহের লেখা পত্র

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত ১২৭ বর্ষীয় শিবানন্দ বাবার জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম : ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট। শ্রীহট্ট জেলা, হবিগঞ্জ মহকুমা, বাহুবল থানা, হরিপুর গ্রামে এক ভিখারি ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রখ্যাত ঠাকুরবাণী বংশে শিবানন্দ বাবার জন্ম হয়। পিতৃদেব শ্রীনাথ গোস্বামী ও মাতৃদেবী ভগবতী দেবী।

বাল্যকাল : বাবার পিতা মাতা দ্বারে ভিক্ষা করে ভিক্ষান্ন নারায়ণকে ভোগ দিয়ে পুত্র কন্যাসহ প্রসাদ পেতেন। তাতে তাদের কোনদিনই পেট ভরতো না। বাবা ৪ বছর পর্যন্ত ভাতের মার খেয়ে বড় হয়েছেন।

নবদ্বীপ বাস : ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাবার পিতা মাতা শিবুর শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার নবদ্বীপ নিবাসী এক বৈষ্ণব বাবাজীর হাতে সমর্পণ করেন। ইনিই বাবার গুরু ওঙ্কারানন্দ গোস্বামী একজন পরম বৈষ্ণব এবং সদ্‌গুরু।

পিতা-মাতা ও দিদির ইহলোক ত্যাগ : ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সদ্‌গুরু ওঙ্কারানন্দ, শিবানন্দকে শ্রীহট্টে পাঠান তাঁর মাতৃদেবী ও পিতৃদেবকে দেখতে। বাড়িতে পৌঁছে শিবানন্দ জানতে পারেন যে, না খেতে পেয়ে তাঁর দিদি মারা গেছে। বাড়িতে যাওয়ার ৭দিন পর সূর্য উঠার আগে মা ও সূর্য উঠার পর বাবা চলে গেলেন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে।

শিক্ষা-দীক্ষা : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শিবানন্দ বাবা সদ্‌গুরু ওঙ্কারানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবিদ্যা অনুশীলনের সাথে সাথে গুরুদেব শিবানন্দের জাগতিক শিক্ষার সব ব্যবস্থা করেন।

গুরুর দেহত্যাগ : ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গুরুদেব ওঙ্কারানন্দ গোস্বামী দেহত্যাগ করেন। শোকে কাতর হয়ে পড়লেও বাবা শোক সামলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্ত, পীড়িত, তাপিত মানুষদের সেবা শুরু করেন।

বৃন্দাবন বাস : ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবা বৃন্দাবনে বাস করেন। বাবা বৃন্দাবন থেকে কাশী চলে আসেন এবং এখনো কাশী বাস করে চলেছেন।

কাশীবাস : ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সদ্‌গুরু শিবানন্দ বাবা বৃন্দাবন থেকে কাশী চলে আসেন এবং এখনো কাশীবাস করে চলেছেন। বাবা বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ ও অর্থের বেগ দমন করতে পারেন তাই তিনিই সদ্‌গুরু এবং তার সাথে গীতোক্ত ২৬টি দৈবী সম্পদ ধারণ করেন। শিবানন্দ বাবা একজন সদ্‌গুরু ও মহাপুরুষ।

দৈনন্দিন জীবন : ভোর ৩টায় শয্যাত্যাগ। সারা দিন জপ-ধ্যান, সকলের মঙ্গলচিন্তা, দান, সেবা ও নিষ্কাম কর্ম করেন। রাত ৯ টায় শয়নে যান। বিভিন্ন সব্জি সিদ্ধসহ অন্নই তাঁর মূল আহার। মিষ্টদ্রব্য, মুগ্ধদ্রব্য ও তেলেভাজা খাদ্য গ্রহণ করেন না।

বাবার প্রিয়তম কর্ম : বাবা হলেন আর্ত, তাপিত, পতিত, পীড়িত, দরিদ্র, বঞ্চিত, অবহেলিত মানষের বন্ধু ও তাদের সেবাই বাবার প্রিয়তম কর্ম। বাবা আজন্ম সিদ্ধ মহাপুরুষঃ গীতোক্ত ২৬টি দৈবী সম্পদ বাবা ধারণ করেন। যেমনঃ ১. দয়া, ২. দান, ৩. যজ্ঞ, ৪. সত্য, ৫. লজ্জা, ৬. ক্ষমা, ৭. তেজ, ৮. ধৈর্য্য, ৯. ত্যাগ, ১০. শান্তি, ১১. অভয়, ১২. অহিংসা, ১৩. তপস্যা, ১৪. শুচিতা, ১৫. স্বাধ্যায়, ১৬. সরলতা, ১৭. পবিত্রতা, ১৮. ক্রোধহীনতা, ১৯. লোভহীনতা, ২০. ইন্দ্রিয় দমন, ২১. জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা, ২২. কারো ক্ষতি না করা, ২৩. নিজেকে অতি বড় মনে না করা, ২৪. চঞ্চলতা ত্যাগ করা, ২৫. নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করা, ২৬. পরের দোষ দেখার বুদ্ধি ত্যাগ করা। বাবা আবাল্য তপস্যা করে চলেছেন শুধুই মানব কল্যাণের জন্য।

জয়পুরের মাতুল বাড়ি শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা

অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য

তখন তিনি বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সবে। বিয়ের পরপরই দেখতে গেলেন পিতৃভূমি। তৎকালীন শ্রীহট্টের (বর্তমানে সিলেট) ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র, বাবা জগন্নাথ মিশ্রের বাস ছিল সে গ্রামেই। জীবিকার তাগিদেই সেখান থেকে নবদ্বীপে আসতেন জগন্নাথ। পরে স্ত্রী শচীদেবীকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে থেকে গেলেন এখানেই। কথিত আছে, বিশ্বম্ভর যখন দেশের বাড়িতে পা রাখলেন তখন চণ্ডী লিখছেন পিতামহ উপেন্দ্র। তাঁর কাছ থেকে সে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। খুব অল্প সময়ে সে কাজ শেষ করে চমকে দিয়েছিলেন পিতামহকে। সন্ন্যাস নেয়ার পর আসমুদ্রহিমাচল ঘুরলেও শ্রীচৈতন্যদেব পিতৃভূমে আর গেছিলেন কি না তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে।

তবে চলতি ১৪৩০ বঙ্গাব্দের (২০২৪ খ্রি.) মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবার নবদ্বীপ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা আসছে তাঁরই মামারবাড়ি বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার জয়পুর গ্রামে, শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে। এদিন সকালে নবদ্বীপ ধামের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির থেকে বিশেষ নিরাপত্তায় দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হবে পাদুকা। দমদম থেকে বিমানে ঢাকায় আনা হবে। সেখান থেকে গাড়িযোগে জয়পুরে। শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে সেখানকার ৪৩তম বার্ষিক উৎসব উদযাপন কমিটির উদ্যোগে মাঘীপূর্ণিমার দিনে শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.) চলবে বিশেষ পুজোপাঠ ও নামসংকীর্তন। সেখানেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা দর্শন করবেন। রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) আবার নবদ্বীপে ফিরে যাবে মহাপ্রভুর পাদুকা।

ভারতীয় গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে মন্দিরের সেবাইত সুদিন গোস্বামী বলেন, এই নিয়ে তৃতীয়বার প্রভুর চরণ পাদুকা বাংলাদেশে যাচ্ছে। দু দেশের মৈত্রীভাবনা আরও মজবুত করতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। লেখক ও চৈতন্য গবেষক চৈতন্যময় নন্দ ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানান, শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে ফিরে বিশ্বম্ভর জানতে পেরেছিলেন স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়েছে সর্পদংশনে। এরপরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বয়স তখন ১৮। ৬ বছরের বিবাহিত জীবনের অন্তে ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বিশ্বম্ভর। সংসার ত্যাগের পর একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে ঘরে ফিরে বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য রেখে গিয়েছিলেন নিজের পাদুকা। বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত সেই পাদুকাই রাখা হয়েছে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দিরে। তিনি জানান, বরাহনগরের পাটবাড়িতে, ভাগবতাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেখানে রয়েছে তাঁর একটি পাদুকা। রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মালদার রামকেলিতে। সেখানেও একটি পাদুকা রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া পুরীর গম্ভীরাতেও রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি পাদুকা। চৈতন্যময়বাবুর কথায়, 'সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকা শ্রীচৈতন্যদেবের চিন্তা-চেতনা আজকের হানাহানির পৃথিবীতে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক। ধর্মের গণ্ডিতে, দেশের সীমানায় কখনওই বেঁধে রাখা যায়নি তাঁকে। তাঁর পাদুকাকে ঘিরে বাংলাদেশের উন্মাদনা সেটাই সামনে আনল নতুন করে।"

এদিকে উইকিপিডিয়ার তথ্য জানিয়েছে, নবদ্বীপ শহরের মহাপ্রভু ধাম মন্দিরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সমিতির তত্ত্বাবধানে রয়েছে শ্রীচৈতন্যর পাদুকা যুগল। কাঠের এই পাদুকা দু'টি ৫০০ বছর আগে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মহাপ্রভু। কথিত রয়েছে, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেয়ার এক বছরের মাথায় শান্তিপুরে এসেছিলেন শচীমাতাকে দর্শনের জন্য। শচীমাতাকে দর্শনের পরেই পুরীধামে চলে যাওয়ার কথা ছিল তার। অচমকা পুরীর যাত্রা বাতিল করে তিনি নবদ্বীপে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীবাস, গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কীর্তন করতে তিনি নবদ্বীপে চলে আসেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেই সময় বাড়িতে পুজো করছিলেন। সন্ন্যাসীদের স্ত্রীর মুখ দর্শনের নিয়ম নেই। তাই উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন

মহাপ্রভু। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঘর থেকে বের হয়ে স্বামীকে প্রণাম করতে যান। প্রণাম শেষ হতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী দেখেন, এক জোড়া পাদুকা রেখে গিয়েছেন মহাপ্রভু। সামনে মহাপ্রভু নেই। ওই দিন রাতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মায়ের স্বপ্নাদেশ পান, জন্মভিটের নিম গাছ থেকে কাঠের বিগ্রহ তৈরি করে পুজো করতে এবং তার সঙ্গে পাদুকাও পুজো হবে। সেই থেকে মহাপ্রভুর পাদুকা পুজো হয়ে আসছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভাইয়ের বংশধররা ওই পাদুকা যুগল সুরক্ষিত রেখেছেন। ১৯৬০সালের পর ওই পাদুকা দু'টিকে একটি রুপোর খাপের মধ্যে রাখা হয়।

সংকলনে- অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক, ৪৩তম বার্ষিক উৎসব উদযাপন পরিষদ, শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম, জয়পুর, বাহুবল, হবিগঞ্জ।

শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গন ধাম পরিদর্শন করলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ স্বামী শিবানন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ভারতের কাশীর বাসিন্দা স্বামী শিবানন্দ বাহুবলের জয়পুরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম পরিদর্শন করেছেন। (৩য় পাতায় দেখুন)

স্বামী শিবানন্দ বাবার শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম পরিদর্শন উপলক্ষে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ স্বামী শিবানন্দ'র বাহুবলের শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গন ধাম পরিদর্শন

বিশেষ প্রতিনিধি। ভারতের কাশীর বাসিন্দা স্বামী শিবানন্দ গতকাল রবিবার সকালে হবিগঞ্জের বাহুবলের জয়পুরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গন ধাম পরিদর্শন করেছেন। এদিন সকালে তিনি নবীগঞ্জের শতকে অবস্থিত ঠাকুরবাণী আশ্রম থেকে রওয়ানা দিয়ে সকাল ১০টার দিকে শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গনে পৌছালে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও ভক্তরা স্বামীজিকে ফুল দিয়ে (৩য় পাতায় দেখুন)

শ্রীশ্রী শচীঅঙ্গন ধামে স্বামী শিবানন্দ

জয় মহাপ্রভু জয় শচীমাতা

শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে প্রথম ভূমিদাতা যারা

সুকেশ চন্দ্র দেব ও বীভাস চন্দ্র দেব

পরম বৈষ্ণব ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের (পিএই ডি, ডি.লিট) প্রেরণাদানে আজীবন জনসেবক শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে ১৩৯০ বঙ্গাব্দের ১৯ ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এর আগে মহানামব্রতজীই কলকাতা থেকে গোস্বামীজিকে চিঠি দিয়ে জানান, শ্রীহট্টের বাহুবলের জয়পুরে রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয়। লুপ্ত এই তীর্থ উদ্ধার করে মহাপ্রভুর মায়ের নামে মন্দির করতে হবে। ব্যাপক গবেষণার পর বর্তমান ভূমির ওপরে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। নির্মাণকালে মন্দিরের জন্য প্রথম ভূমি দান করেন মন্দিরের পশ্চিমের বাড়ির নদীয়া চাঁদ দেবের তিন ছেলে নীরোদ চন্দ্র দেব, উপেন্দ্র চন্দ্র দেব ও কানাই লাল দেব (২০ শতাংশ ভূমি), মন্দিরের দক্ষিণের বাড়ির সুরেন্দ্র চন্দ্র দেবের দুই ছেলে ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেব ও শচীন্দ্র চন্দ্র দেব (২০ শতাংশ ভূমি), এবং মন্দিরের উত্তরের বাড়ির গোপাল চক্রবর্তী (৬ শতাংশ ভূমি)। সেই সময় থেকে মন্দিরে ভক্ত সমাগত হতে শুরু করে এবং বহু ভক্ত কয়েকদফায় আরো জমি কিনে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দিরে দান করেন। ভক্তের অনুদানে নির্মিত শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দির আজ বিশ্ব পরিচিতি লাভ করে।

নির্মাণের ৪০ বছরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামের উন্নয়নে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। বর্তমানে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম মন্দিরের উন্নয়ন ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন আমাদের জয়পুর গ্রামেরই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ উমাপদ ভট্টাচার্য্যের সুযোগ্য সন্তান আমাদের ছোট ভাই সাংবাদিক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য। পরিশেষে এটাই প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মায়ের বাড়ি শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।

লেখক : শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে ভূমিদাতা শচীন্দ্র দেবের সন্তান শ্রী সুকেশ চন্দ্র দেব ও ধীরেন্দ্র দেবের সন্তান শ্রী বীভাস চন্দ্র দেব।

পূর্বজন্মের পুণ্যেই এমন প্রাপ্তি

শেখর রঞ্জন দেব

যুগে যুগে ভগবান স্বয়ং অথবা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা ধর্মের প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রেম ধর্মের প্রচার পূর্বে কখনও হয়নি। এমন সহজ পদ্ধতি অন্য কোনো যুগে পূর্বে প্রদর্শিত হয়নি। কোনো প্রকার যোগ্যতা ছাড়াই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করার সুযোগ এই কলি যুগেই লাভ করা যায়।

মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, জীবকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করার জন্য আর্বিভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের দুঃখ দূর করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কারণ সন্নাসীদের সকলে প্রণাম নিবেদন করে। তাই কেউ যদি শুধুমাত্র সন্ন্যাসী মনে করে প্রণাম করে তবুও জীব উদ্ধার হয়ে যাবে। এমন কৃপাময় মহাপ্রভুর যে ভজনা করে না তাকে সর্বোত্তম অসুর বলে গণ্য করা যায়।

ধর্মের নামে যে কত অধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কথা চিন্তা করলেই অন্তর কেঁপে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার প্রেম দ্বারা যে কল্যাণ সাধন করেছেন তার ফলে বর্তমান আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। যদি তিনি না এসে যুগ ধর্ম প্রবর্তন করতেন তবে আজ ধর্ম নিগ্রহে মানুষের শান্তি থাকত না। কিন্তু আজ কত জনই বা চৈতন্য মহাপ্রভুর এই বিশেষ অবদান সম্পর্কে জানেন?

এক্ষেত্রে আমরা খুবই ভাগ্যবান। আমার জন্ম হয়েছে জয়পুরে। যে গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মায়েরবাড়ি। মায়েরবাড়িতে গড়ে উঠেছে শ্রীশ্রীশচঅঙ্গন ধাম। প্রতিদিন বহু ভক্ত শচীমাকে প্রণাম করতে আসেন। সেই মন্দিরের বার্ষিক উৎসবে গত আট বছর ধরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। পূর্বজন্মের পুণ্যফলের জন্যই মনে হয় মহাপ্রভু আমাকে এই পদে বসিয়েছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদের সকলকে ভালো রাখুন।

লেখক : সভাপতি, ৪৩তম বার্ষিক উৎসব উদযাপন পরিষদ। শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম, জয়পুর।

নবরূপে সেজে উঠছে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম

পরিতোষ বণিক

সনাতনধর্মের অন্যতম তীর্থস্থান মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম, জয়পুর। এই পুণ্যভূমি শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তীর আবির্ভাব স্থান। শচীদেবীর বাড়ি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুলালয়, যিনি নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত। ১৯৮৩ সালে পরম বৈষ্ণব ও দার্শনিক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী জয়পুরে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পুণ্যধামে ঢুকে প্রণাম করতে অগ্রসর হলেই দেখা যায়, শচীমাতার কোলে শিশু নিমাই বসে আছেন। ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজিই এমন মূর্তি চিন্তা করে গেছেন। শচীমায়ের কোলে শিশু নিমাই এখানে নিত্য পূজিত বিগ্রহ। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শচীদেবীর বাবা নীলাম্বর চক্রবর্তী। বছরজুড়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও উৎসব উদযাপনে মুখর থাকে এ ধাম। তার মধ্যে বার্ষিক উৎসব হচ্ছে তারকব্রহ্ম নামযজ্ঞ। এতে দেশ ও বিদেশ থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। পাশাপাশি উৎসবকে কেন্দ্র করে গুণিজনদের মিলনমেলাও ঘটে। মহাপ্রভুর মায়ের বাড়ি শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামকে কেন্দ্র করে আমরা তরফ পরগনা তথা জয়পুর, ইজ্জতনগরসহ পুরো এলাকার বাসিন্দারা ধন্য। পূর্বজন্মের সুকৃতীর ফলেই আমাদের জীবনে তা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করি।

প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে ধীরে ধীরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। এতে নবরূপে সেজে উঠছে পবিত্র এই ভূমি। এরইমধ্যে এ অঙ্গনকে ঘিরে 'স্বপ্নের শচীঅঙ্গন' নামে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাস্টার প্ল্যানের আওতায় দৃষ্টিনন্দন মূলমন্দির পুনর্নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। মহাপ্রভুর কৃপায় চলমান উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হলে মূল মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

জয়পুরের এই ধাম অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও অনন্য নিদর্শন। প্রতিবছর এখানে উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা আয়োজন থাকে। এবার সিলেট বিভাগের সবচেয়ে বড় গীতা পাঠের আসর বসছে। পাশাপাশি নবদ্বীপ থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা আনা হয়েছে তাঁরই মাতৃভূমি শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামে। এই দুটি পর্ব পাঁচদিনের উৎসবকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। এছাড়াও এই উৎসব থেকে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছে। এরইমধ্যে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধামের নামে একটি ওয়েবসাইট প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন থেকে মন্দিরের সব তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, আগে থেকেই গুগল ম্যাপেও শচীঅঙ্গনের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবকাজের জন্য আমি ৪৩তম বার্ষিক উৎসবের সাধারণ সম্পাদক ও মন্দির পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ জানাই। মূলত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই মন্দির এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে আমার মত নগণ্য একজন মানুষকে শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এটা আমার পরম সৌভাগ্য। আমার মেয়াদকালে আমি চেষ্টা করব সকলকে সঙ্গে নিয়ে তৈরিকৃত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী মন্দিরের উন্নয়নে কাজ করতে।

মহাপ্রভুর নিকট বিশ্বের সকল জীবের মঙ্গল ও সুস্থতা প্রার্থনা করি। জয় মহাপ্রভু, জয় শচীমাতা।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক, শ্রীশ্রীশচীঅঙ্গন ধাম পরিচালনা পর্ষদ, জয়পুর।